শ্রীঅরবিন্দ

যোগের পথে আলো

কাল্‌চার পাব্‌লিশার্স
২৫এ, বকুল বাগান রো, কলিকাতা

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত ও শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক অনূদিত

[শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণের প্রশ্নের উত্তরে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে সঙ্কলন করিয়া ইংরাজি "Lights on Yoga" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকখানি তাহারই বাংলা অনুবাদ]

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৪৮

মূল্য—১৲

প্রকাশক শ্রীতারাপদ পাত্র, দি কাল্‌চার পাবলিশার্স, ২৫এ, বকুল বাগান রো, কলিকাতা। মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা।

সূচীপত্র

১৩।

লক্ষ্য

যে যোগপন্থা এখানে অনুসৃত হয় অন্যান্য যোগপন্থা হইতে তাহার উদ্দেশ্য ভিন্ন—কেননা ইহার লক্ষ্য কেবল মাত্র সাধারণ অজ্ঞান ঐহিক-চেতনা হইতে ভাগবত চেতনায় উঠিয়া যাওয়া নয়, পরন্তু মনপ্রাণদেহের অজ্ঞানতার মধ্যে সেই ভাগবত চেতনার বিজ্ঞানশক্তিকে নামাইয়া আনা, তাহাদিগকে রূপান্তরিত করা, এইখানেই ভগবানকে প্রকট করা এবং জড়ের মধ্যে দিব্য-জীবন সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্য অত্যন্ত সুকঠোর এবং এই যোগপন্থা অতীব দুরূহ: অনেকের বা অধিকাংশেরই কাছে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে। সাধারণ অজ্ঞান ঐহিক-চেতনার সমুদয় সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তি ইহার বিরোধী, ইহাকে তাহারা অস্বীকার করে, ব্যাহত করিতে প্রয়াস পায়। সাধক দেখিতে পাইবে তাহার নিজের মনপ্রাণদেহ ইহার সিদ্ধির পথে একান্ত দুর্দ্ধর্ষ বাধারাজির দ্বারা পরিপূর্ণ। যদি তুমি এই আদর্শকে সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পার, সমুদয় বাধার সম্মুখীন হইতে পার, অতীত ও তাহার বন্ধনগুলিকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পার এবং এই দিব্য সম্ভাবনার জন্য সব কিছু বিসর্জন দিতে ও সর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত থাক, কেবল তখনই তুমি তাহার

মধ্যে যে সত্য রহিয়াছে তাহা সাক্ষাৎ-অনুভূতির সহায়ে আবিষ্কার করিবার আশা করিতে পার।

এই যোগের সাধনা কোন নির্দ্দিষ্ট মানসিক শিক্ষা বা মন্ত্র অথবা ধ্যানধারণার ঐ জাতীয় অন্য কিছু বিধিবদ্ধ প্রণালী ধরিয়া চলে না, ইহা অনুসরণ করে আস্পৃহার পথ, চলে অন্তর্মুখী ও উর্দ্ধমুখী আত্মসমাহিতির দ্বারা. এখানে প্রয়োজন উপরস্থ একটা ভাগবত প্রভাব ও তাহার ক্রিয়ার কাছে, হৃদয়ে ভগবানের জাগ্রত অধিষ্ঠানের কাছে, নিজেকে খুলিয়া ধরা এবং এইগুলি হইতে যাহা কিছু অন্যধর্ম্মী সে সকল বর্জ্জন করা। শ্রদ্ধা, আস্পৃহা ও সমর্পণের দ্বারা এই আত্ম-উন্মীলন আসিতে পারে।

*
* *

এখানে যে একমাত্র সৃষ্টির স্থান রহিয়াছে তাহা অতিমানস সৃষ্টি, দিব্য সত্যকে নিম্নের এই পৃথিবীতে নামাইয়া আনা, শুধু মনে ও প্রাণে নয়, শরীরে এবং জড়ের মধ্যেও। আমাদের উদ্দেশ্য অহংকে প্রসারিত করিয়া তাহার যাবতীয় 'গণ্ডী' দূরীভূত করা নয় অথবা মানবীয় মনের ভাবসমূহের বা অহংমুখী প্রাণশক্তির চরিতার্থতার জন্য মুক্ত ক্ষেত্র এবং অবাধ আয়তন করিয়া দেওয়া নয়। এখানে আমাদের কেহই 'যদৃচ্ছা কাজ' করিবার জন্য নাই অথবা এমন একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইবার জন্যও নাই যেখানে অবশেষে আমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম হইব। আমরা এখানে

আছি ভগবান্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সম্পাদন করিতে এবং এমন একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইতে যেখানে ভাগবতী ইচ্ছা আর মানুষী অজ্ঞানতার দ্বারা পঙ্গু বা প্রাণের বাসনার দ্বারা বিকৃত ও ভ্রান্তভাবে রূপায়িত না হইয়া স্বীয় সত্যকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে। অতিমানস যোগের সাধককে যে কাজ করিতে হয় তাহা তাহার নিজের কাজ নয়—যাহার উপর সে নিজের ব্যবস্থা সব আরোপ করিতে পারে। তাহাকে করিতে হইবে ভগবানের কাজ, ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে। আমাদের যোগ আমাদের জন্য নয় পরন্তু ভগবানেরই জন্য। আমাদের ব্যক্তিগত প্রকাশ—সকল-সীমামুক্ত ও সর্ব্ববন্ধনবিহীন ব্যষ্টিগত অহং-এর প্রকাশ—আমরা খুঁজিব না। আমরা চাহিব ভগবানেরই প্রকাশ। আমাদের আপন অধ্যাত্মমুক্তি, সিদ্ধি, পূর্ণতা, সে ভাগবত প্রকাশেরই একটা ফল, একটা অংশ মাত্র হইবে; তাহাও আবার কোন রকম অহংবারের দিক দিয়া নয় অথবা কোন অহংমুখী বা স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও নয়। এই মুক্তি, সিদ্ধি, পূর্ণতাও আবার আমাদের জন্য কিছু নয়, ইহাও ভগবানেরই জন্য।

*
* *

এই যোগ শুধু ভাগবত উপলব্ধিকেই নয়, পরন্তু অন্তর্জীবনের ও বহির্জীবনের সম্পূর্ণ উৎসর্গ ও পরিবর্ত্তনকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহা একটা

দিবা চেতনাকে প্রকাশ করিয়া ধরিবার এবং একটা ভাগবত কর্ম্মের অঙ্গীভূত হইবার সামর্থ্য লাভ করিতেছে। ইহার অর্থ এমন এক আন্তর অনুশীলন যাহার দাবী কেবলমাত্র নৈতিক ও শারীর তপস্যাসমূহ হইতে অনেক অধিক ও যাহা বহুপরিমাণে কঠোরতর। অধিকাংশ যোগপন্থা হইতে বহুগুণে আয়াসসাধ্য এবং বৃহত্তর এই যোগপথে কাহারও প্রবেশ করা উচিত নয় যদি না সে তজ্জন্য অন্তরাত্মার আহ্বান ও শেষ পর্য্যন্ত সব কিছু অতিক্রম করিয়া চলিবার নিষ্ঠা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়।

*
* *

পূর্ব্বতন যোগপন্থাগুলি আত্মোপলব্ধির সন্ধানই করিয়াছিল—যে আত্মা সর্ব্বাবস্থায় মুক্ত ও ভগবানের সহিত একীভূত। স্বভাবকে ততখানিই পরিবর্ত্তিত করিতে হইত যতখানি পরিবর্ত্তনের পর সেই জ্ঞান ও অনুভূতির পথে উহা আর বিঘ্ন হইয়া না দাঁড়ায়। জড় স্তর পর্য্যন্ত পূর্ণ পরিবর্ত্তন স্বল্প কয়েকজনেরই অনুসন্ধানের বিষয় ছিল এবং তাহাও ছিল 'সিদ্ধি' হিসাবেই, অন্য কিছুর জন্য নয়—মর্ত্ত্য চেতনায় নূতন একটা প্রকৃতির প্রকাশ হিসাবে নয়।

*
* *

প্রাণবন্ত জড়ের মধ্যে মনোময-বিগ্রহধারী মানুষের সমস্ত চেতনাকেই আরোহণের দ্বারা ঊর্দ্ধ-চেতনার সহিত

সংযোগ-সাধন করিতে হইবে। ঊর্দ্ধ-চেতনাকেও মনে, প্রাণে, জড়ে অবতরণ করিতে হইবে। এইভাবে বাধাসমূহ অপসারিত হইবে এবং ঊর্দ্ধ-চেতনা সমগ্র নিম্নপ্রকৃতিকে অধিকার করিতে ও বিজ্ঞান-শক্তির দ্বারা তাহার রূপান্তর সাধন করিতে সমর্থ হইবে।

*
* *

পৃথিবী বিবর্ত্তনের জড়ময় ক্ষেত্র। মন ও প্রাণ, বিজ্ঞান, সচ্চিদানন্দ মূলতঃ সেই পার্থিব চেতনায় অন্তর্লীন. কিন্তু প্রথমে জড়ই সুসংগঠিত হইয়াছে পরে প্রাণভূমি হইতে প্রাণ অবতরণ করিয়া জড়স্থিত প্রাণসত্তার মধ্যে আকার, সংগঠন ও সক্রিয়তা আনিয়া দিয়াছে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছে তারপর মনোভূমি হইতে মন অবতরণ করিয়া মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে। এক্ষণে অতিমন (বিজ্ঞান) অবতরণ করিয়া অতিমানস জাতি সৃষ্টি করিবে।

*
* *

সৃষ্টিক্ষম সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে প্রকৃতির অধীনতা হইতে পুরুষকে মুক্ত করাই যথেষ্ট নহে. অজ্ঞান শক্তিরাজির খেলা লইয়া যে নিম্নপ্রকৃতি তাহার বশ্যতা হইতে পুরুষকে পরা দিব্য-শক্তির, মায়ের আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় লইয়া যাইতে হইবে।

ভাগবতী জননীকে নিম্ন প্রকৃতি এবং তাহার যন্ত্রবৎ পরিচালিত শক্তিসমূহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা একটা ভ্রান্তি। নীচের এই প্রকৃতি একটা কৌশল মাত্র— বিবর্ত্তনশীল অজ্ঞানতার ক্রিয়ার জন্য ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। অজ্ঞান মনোময় প্রাণময় বা দেহময় সত্তা নিজেই যেমন ভগবান্ নয়—যদিও ভগবান্ হইতেই উহাদের উদ্ভব— সেইরূপ প্রকৃতির এই যান্ত্রিক কৌশলও ভাগবতী জননী নয়। অবশ্য ইহা ঠিক যে মায়ের সত্তার একটা অংশ এই কলকৌশলের মধ্যে ও তাহার পিছনে বিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, কিন্তু মা নিজে যাহা তাহা অবিদ্যার কোন শক্তি নহে—তাহা হইল ভাগবত চৈতন্য, শক্তি ও জ্যোতি—সেই পরাপ্রকৃতি, মুক্তি ও দৈবী সংসিদ্ধির জন্য যাহার শরণ আমরা লইয়া থাকি।

মুক্তির একটা উপায় পুরুষ-চেতনার উপলব্ধি—স্থির, মুক্ত, শক্তিরাজির খেলার দ্রষ্টা, তাহাদের মধ্যে আসক্ত বা জড়িত নহে। এই স্থিরতা, এই অনাসক্তি, একটা শান্ত সামর্থ্য ও আনন্দ (আত্মরতি) শুধু মনে নয়, প্রাণে ও দেহস্তরে পর্য্যন্ত নামাইয়া আনিতে হইবে। এইটি যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে প্রাণজ শক্তিসমূহের বিক্ষোভে কবলিত হইয়া আর থাকিতে হয় না। তবে এই স্থিরতা, শান্তি ও নিরব সামর্থ্য এবং আনন্দ আধারের মধ্যে মায়ের শক্তির প্রথম অবতরণ মাত্র। তাহার ঊর্দ্ধে এমন এক জ্ঞান, এক কর্ম্মকৃৎ শক্তি, এক

সৃষ্টিক্ষম আনন্দ আছে যাহা সাধারণ প্রকৃতির সর্বোত্তম এবং পরম সাত্ত্বিকী অবস্থাকেও অতিক্রম করিয়া আছে —তাহা ভাগবতী প্রকৃতি।

প্রথমে অবশ্য প্রয়োজন স্থৈর্য্য, শান্তি, মুক্তি। অকালে দিব্যপ্রকৃতির সৃষ্টিক্ষম দিকটি নামাইয়া আনিবার চেষ্টা করা সমীচীন নহে, কেননা উহা হইবে বিক্ষুব্ধ ও অশুদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে অবতরণ—সে প্রকৃতি ঐ অবতরণকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে না, ফলে গুরুতর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে।

*
* *

অতিমানস (বিজ্ঞান) যদি নিম্নতর ভূমিসমূহের সত্য অপেক্ষা আমাদের এক বৃহত্তর ও পূর্ণতর সত্য না আনিয়া দেয় তাহা হইলে সেখানে পৌঁছিবার প্রয়াসের কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যেক ভূমির নিজস্ব সত্য সব আছে। তাহাদের কোন কোনটি ঊর্দ্ধতর ভূমিতে উঠিলে আর সত্য থাকে না; যেমন—বাসনা ও অহংকার মনোগত, প্রাণগত ও দেহগত অজ্ঞানতার ক্ষেত্রের সত্য। এইক্ষেত্রে মানুষ অহংকার বা বাসনা ব্যতিরেকে তামসিক যন্ত্র-পুত্তলিকা মাত্র হইয়া পড়ে, কিন্তু যত আমরা ঊর্দ্ধে আরোহণ করি, অহংকার ও বাসনা সত্য বলিয়া আর প্রতিভাত হয় না—তাহারা তখন মিথ্যা, সত্য পুরুষ ও সত্য ইচ্ছাকে বিকৃত আকার দেয়। জ্যোতির শক্তিরাজি এবং অন্ধকারের শক্তিরাজির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উহা এই এখানকার

সত্য। যত আমরা উর্দ্ধে আরোহণ করি, ততই ইহার সত্য ক্ষীণতর হইতে থাকে এবং বিজ্ঞানভূমির মধ্যে ইহার কোন সত্যই আর থাকে না। অন্যান্য সত্য উদ্বর্ত্তিয়া থাকে, কিন্তু সমগ্রের মধ্যে তাহাদের প্রকৃতি, গুরুত্ব এবং তাহাদের স্থান পরিবর্ত্তিত হয়। ব্যক্তি ও নির্ব্যক্তির যে পার্থক্য বা বৈরূপ্য তাহা অধিমানসের সত্য, বিজ্ঞানভূমিতে তাহাদের পৃথক্ কোন সত্য নাই, তাহারা সেখানে অচ্ছেদ্যরূপে এক। কিন্তু অধিমানসের সত্যগুলি আয়ত্ত না করিয়া, জীবনে সংসিদ্ধ না করিয়া, অতিমানস সত্যে পৌঁছিতে পারা যায় না। মানুষের অনধিকারী প্রকৃতি আমন্ত্রিতা জিনিষে জিনিষে একান্ত পার্থক্যের সৃষ্টি করে, অবশিষ্ট সব-কিছুকে অসত্য আখ্যা দিয়া একেবারেই সর্ব্বোচ্চ সত্যে—উহা যাহাই হৌক না কেন—গিয়া উত্তীর্ণ হইতে চায়, কিন্তু তাহা দুরাকাঙ্ক্ষা-প্রসূত উদ্ধত এক ভ্রান্তি। সাধককে ধাপের পর ধাপ আরোহণ করিতে হয় এবং প্রতি পাদপীঠে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে হয়। এইভাবেই সর্ব্বোচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়।

*
* *

নিম্নপ্রকৃতি এবং তাহার বাধাগুলি লইয়া অতিরিক্ত জল্পনা করা ভুল—উহা সাধনার নেতির দিক। বাধাগুলিকে দেখিতে এবং শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, কিন্তু একমাত্র অবশ্য-কর্ত্তব্য হিসাবে উহাদিগকে লইয়া ব্যস্ত থাকা সাধনার সহায় নয়। অবতরণের অনুভূতি হইল 'ইতি'র

দিক, উহাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। (সাধককে যদি ইতি-মুখী অনুভূতিকে আহ্বান ও অবতরণ করাইবার পূর্ব্বে নিম্নপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ ও অন্তিম শুদ্ধির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে হয়তো চিরকালই অপেক্ষা করিতে হইবে। সত্য বটে নিম্নপ্রকৃতি যতই অধিক শুদ্ধ হইবে ঊর্দ্ধপ্রকৃতির অবতরণ ততই সহজ হইয়া উঠিবে, কিন্তু ইহাও সত্য এবং অধিকতর সত্য যে ঊর্দ্ধ প্রকৃতি যতই অবতরণ করিবে নিম্নপ্রকৃতি ততই পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে।) [সম্পূর্ণ শোধন বা স্থায়ী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ হঠাৎ ঘটিতে পারে না, উহা সময় ও ধীর ক্রমোন্নতি সাপেক্ষ।] জিনিষ দুইটি (শুদ্ধি ও প্রকাশ) পাশাপাশি চলিতে থাকে এবং উভয়ে ক্রমশঃ যত অধিকতর শক্তিশালী হয়, পরস্পরের সহায়ও তত বেশি হয়—সাধনার উহাই সাধারণ ধারা।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না চেতনার রূপান্তর হয় ততক্ষণ অনুভূতির ঐরূপ তীব্র অবস্থা টিকিয়া থাকে না। পরিপাকের জন্য একটা সময়েরও প্রয়োজন হয়। সত্তা যতক্ষণ অচেতন থাকে ততক্ষণ এই পরিপাক অন্তরালে অথবা অধস্তলে চলিতে থাকে, ইতিমধ্যে বহিশ্চেতনা দেখে শুধু অসাড়তা ও প্রাপ্ত বস্তুর বিনষ্টি. কিন্তু সাধক সচেতন হইলে দেখিতে পায় ঐ পরিপাক চলিতেছে এবং আরো দেখিতে পায় যে কিছু নষ্ট হয় নাই—উপর হইতে

যাহা অবতরণ করিয়াছে উহা নীরবে আধারের মধ্যে স্থিতিলাভ করিতেছে।

যে বিশালতা, যে সর্ব্বজয়ী শান্তি ও নীরবতার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছ অনুভব কর উহাকে আত্মা বা শান্ত ব্রহ্ম বলে। আত্মা বা শান্ত ব্রহ্মের এই উপলব্ধি ও তাহাতে বাস করাই অনেক যোগপন্থার একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের যোগে উহা ভগবৎসিদ্ধির এবং সত্তার উদ্ধতর বা ভাগবত চেতনায় যে উন্নয়ন—যাহাকে আমরা রূপান্তর বলি—তাহার প্রথম সোপান মাত্র।

*

* *

স্ব-পুরুষ বা আত্মা এবং অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ, এই দুয়ের একটি রূপে কিম্বা উভয় রূপে প্রকৃত সত্তাকে অনুভব করা যায়। দুয়ের পার্থক্য এই—একটি বিশ্বময়রূপে ও অপরটি মন-প্রাণ-দেহের ভর্ত্তা ব্যষ্টিরূপে অনুভূত হয়। সাধক যখন প্রথমে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন উহা সর্ব্ববস্তু হইতে পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন, আপনাতে আপনি স্থিত বলিয়া অনুভব করে। এই প্রকার উপলব্ধির সহিতই শুষ্ক নারিকেল ফলের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। অন্তরাত্মার উপলব্ধি হয় কিন্তু অন্যভাবে। ইহা ভগবানের সঙ্গে ঐক্যবোধ, তাঁহার উপর নির্ভরতা ও একমাত্র ভগবানেরই কাছে অনন্যমুখী উৎসর্গ আনিয়া দেয়, আরো দেয় প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করিবার এবং সত্য মন, সত্য প্রাণ ও সত্য শরীর-সত্তা চিনিয়া

লইবার ক্ষমতা। এই যোগে উভয় প্রকার অনুভূতিরই প্রয়োজনীয়তা আছে।

'আমি' বা এই ক্ষুদ্র অহং প্রকৃতির গঠিত। তাহা মনোময়, প্রাণময় ও জড়ময় এক রূপায়ন এবং তাহার উদ্দেশ্য বহিশ্চেতনা ও কর্ম্মকে কেন্দ্রীভূত করা ও ব্যষ্টিগত রূপ দেওয়া। প্রকৃত সত্তা আবিষ্কৃত হইলে এই অহং-এর কার্য্যকারিতা শেষ হইয়া যায় এবং এই রূপটিকেও বিদায় লইতে হয়—প্রকৃত সত্তাই তাহার স্থলে অনুভূত হইয়া থাকে।

*
* *

গুণত্রয় বিশুদ্ধ, পরিমার্জ্জিত ও রূপান্তরিত হইয়া তাহাদের দিব্য স্বরূপা লাভ করে : সত্ত্ব হয় জ্যোতিঃ—খাঁটি অধ্যাত্ম আলো, রজঃ হয় তপঃ—শান্ত অথচ তীব্র ভাগবতী শক্তি, তমঃ হয় শম—দিব্য স্থিরতা, বিরাম, শান্তি।

*
* *

ব্রহ্মাণ্ডে তিনটি শক্তি আছে, সকল জিনিষ তাহাদের অধীন—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। সৃষ্টপদার্থ মাত্রেই কিছু-কালের জন্য স্থায়ী হয়, তারপর ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ধ্বংসশক্তির অপসারণের অর্থ এমন এক সৃষ্টি যাহার বিনাশ হইবে না, যাহা বর্ত্তিয়া থাকিবে, উত্তরোত্তর বিকাশ পাইয়াই চলিবে। অজ্ঞানতার ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য ধ্বংসের প্রয়োজন আছে। পরাজ্ঞানের মধ্যে, সত্যাত্মক সৃষ্টিতে প্রলয়-বিহীন অবিরাম অভিব্যক্তিই নিয়ম।

আধারের স্তর ও অংশ

মানুষ নিজেকে জানে না এবং আপনার সত্তার বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক্ করিয়া চিনিতেও শিখে নাই। সমস্তকে সে সাধারণতঃ একত্রে মিশাইয়া মন নামে অভিহিত করে. ইহার কারণ, একটা মানসিক প্রতীতি ও বুদ্ধির সহায়ে সে এ সকলকে জানে বা অনুভব করে, তাই নিজের অবস্থা বা কার্য্যগুলি সে বুঝিতে পারে না অথবা পারিলেও তাহা একান্ত উপরে-উপরে। আমাদের প্রকৃতির বিপুল জটিলতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, যত বিভিন্ন শক্তি ইহাকে চালায় তাহাদের দেখা এবং সেই প্রকৃতির উপর একটা নিয়ামক জ্ঞানের শাসন স্থাপন করা—ইহা যোগের ভিত্তিরই অংশ। অনেক অঙ্গ লইয়া আমরা গঠিত। আমাদের চেতনা, আমাদের চিন্তা, ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়বোধ, অনুভূতি ও কর্ম্ম লইয়া আমাদের যে সমগ্র গতিধারা তাহার মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গটিরই কিছু না কিছু দান আছে. কিন্তু আমরা এই সব প্রবেগের উদ্ভবস্থল বা প্রবাহ-সূত্র দেখিতে পাই না, বাহিরে বাহিরে তাহাদের বিপর্য্যস্ত বিশৃঙ্খল যে সব ফল দেখা দেয়, মাত্র তাহা আমরা লক্ষ্য করি কিন্তু তাহাদের উপর একটা অনিশ্চিত ও অস্থায়ী শৃঙ্খলা ছাড়া বেশি কিছু আমরা স্থাপন করিতে পারি না।

ইহার প্রতীকার এক আসিতে পারে সত্তার যে সমুদয় অংশ জ্যোতির দিকে পূর্ব্বেই উন্মুখ হইয়াছে তাহাদের

হইতে। ভাগবত চেতনার জ্যোতিকে ঊর্দ্ধ হইতে আহ্বান করিয়া আনা, চৈত্য-সত্তাকে সম্মুখে আনিয়া ধরা, এমন আস্পৃহার বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া তোলা যাহা বহিস্তন মনকে অধ্যাত্মভাবে জাগ্রত করিয়া ধরিবে এবং প্রাণ-সত্তাকে সমিদ্ধ করিয়া তুলিবে—ইহাই উদ্ধারের পথ।

*
* *

যোগের অর্থ ভগবানের সঙ্গে মিলন—সে মিলন হইতে পারে বিশ্বাতীত অথবা বিশ্বগত অথবা ব্যষ্টিগত অথবা যেমন আমাদের যোগে—সব তিনটি একত্রে। অথবা ইহার অর্থ এমন এক চেতনার মধ্যে প্রবেশ করা যাহার ফলে সাধক আর ক্ষুদ্র অহং, ব্যক্তিগত মন, ব্যক্তিগত প্রাণ ও শরীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে না পরন্তু যুক্ত হয় পরমাত্মার সহিত বা বিশ্বচেতনার সহিত বা ভিতরের এমন একটা গভীরতর চেতনার সহিত যেখানে সাধক আপন অন্তরাত্মা, আপন আন্তর সত্তা ও অস্তিত্বের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন। যৌগিক চেতনায় সাধক শুধু বস্তুরাজি সম্বন্ধেই নয়, শক্তিরাজি সম্বন্ধেও সচেতন হয়, শুধু শক্তিরাজি সম্বন্ধেই নয়—তাহাদের পিছনে যে চৈতন্যময় সত্তা আছে তাহার সম্বন্ধেও। শুধু নিজের মধ্যে নয় বিশ্বের ভিতরেও এইসব জিনিষ সম্বন্ধেই সে সচেতন হয়।

এমন এক শক্তি আছে যাহা নূতন চেতনার বিকাশের সহগামী, একদিকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিজে বাড়িয়া চলে অন্যদিকে যুগপৎ আবার ইহারই আবির্ভাব ও সম্পূর্ণতা

সাধনে সাহায্য করে। ইহার নাম যোগশক্তি। আমাদের আন্তর সত্তার কেন্দ্রগুলিতে (চক্রগুলিতে) ইহা কুণ্ডলীভূত ও প্রসুপ্ত হইয়া আছে। ইহা আধার-মূলে তন্ত্রোক্ত কুণ্ডলিনী শক্তি। কিন্তু ইহা আমাদের উপরেও আছে—আমাদের মস্তকের ঊর্ধ্বে ভাগবতী শক্তিরূপে—সেখানে আর কুণ্ডলীকৃত, অন্তর্লীন, প্রসুপ্ত নহে কিন্তু জাগ্রত, জ্ঞানময়, শক্তিময়, বিস্তৃত ও ব্যাপক—প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই ভাগবতী শক্তির কাছে—মাতৃশক্তির কাছে আমাদিগকে নিজেদের খুলিয়া ধরিতে হইবে। মনে ইহা ভাগবত মনঃশক্তি বা বিশ্বগত মনঃশক্তিরূপে নিজেকে প্রকট করে এবং ব্যক্তিগত মনের যাহা অসাধ্য তৎসমস্তই ইহার পক্ষে সম্ভব, ইহা তখন যৌগিক মনঃশক্তি। তেমনি ইহা যখন প্রাণে বা জড়ের স্তরে প্রকটিত হয় ও কাজ করে তখন ইহা যৌগিক প্রাণশক্তি বা যৌগিক শারীর শক্তিরূপে ব্যক্ত হয়। এই সব রকম রূপ ধরিয়াই ইহা জাগ্রত হইতে পারে, কখন ঊর্ধ্বে ও বহির্দিকে উৎসারিত হয়—নিম্ন হইতে বৃহত্ত্বের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া ধরে আবার কখন ঊর্ধ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধক শক্তিরূপে এই নিম্নজগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শরীরের মধ্যে নামিয়া আসিয়া কাজ করিয়া সেখানে তাহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া, উপরের বৃহত্ত্বের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া সে আমাদের নিম্নতন সত্তার সঙ্গে ঊর্ধ্বতন সত্তার সংযোগ বিধান করে, ব্যক্তিকে

বিশ্ব সার্ব্বভৌমিকত্বে অথবা কৈবল্যের ও সর্ব্বাতীতের মধ্যে মুক্তি দিতে পারে।

*
* *

আমাদের যোগের পদ্ধতিতে কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটির নির্দ্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক উপযোগিতা ও সাধারণ ক্রিয়া আছে আর উহাই তাহাদের সকল বিশেষ শক্তি ও কার্য্যাবলীর ভিত্তিস্বরূপ। মূলাধার জড়স্তর হইতে অবচেতন পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে। জঠরকেন্দ্র—স্বাধিষ্ঠান—নিম্নতর প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করে, নাভিকেন্দ্র—নাভিপদ্ম বা মণিপুর—বৃহত্তর প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করে, হৃদয়কেন্দ্র—হৃৎপদ্ম বা অনাহত—ভাবাবেগময় সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, কণ্ঠকেন্দ্র—বিশুদ্ধ—বহিঃপ্রকাশক স্থূলরূপদাতা মনকে নিয়ন্ত্রিত করে; ভ্রূমধ্যস্থ কেন্দ্র—আজ্ঞাচক্র—সৃষ্টিক্ষম মন, ইচ্ছাশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, মানস রূপায়নকে নিয়ন্ত্রিত করে; সহস্রদল পদ্ম ঊর্দ্ধে থাকিয়া উচ্চতর চিন্তাশীল মনের উপর রাজত্ব করে, আরো ঊর্দ্ধতর জ্যোতিষ্ময় মনের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্ররূপে বিরাজ করে, শেষে তার সর্ব্বোচ্চ পদে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা সম্বোধির দিকে দুয়ার খুলিয়া ধরে যাহার ভিতর দিয়া অথবা একটা সাক্ষাৎ পরিপ্লাবনের দ্বারা অধিমানস অন্যান্য স্তর সমূহের সঙ্গে আদান-প্রদান করিতে অথবা তাহাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে পারে।

*
* *

আমাদের যোগে যাহাকে আমরা অবচেতনা বলি তাহা হইতেছে আমাদের সত্তার সেই সম্পূর্ণ নিমজ্জিত চৈতন্যের অংশটি যেখানে জাগ্রতভাবে সচেতন ও সুসংবদ্ধ চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভব বা সুশৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া নাই, তবুও যেখানে গুপ্তভাবে সব জিনিষেরই চিহ্ন গৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। এখান হইতেই, যত প্রকার প্ররোচনা, অভ্যাসের নিত্য ক্রিয়া সব কখন স্থূলভাবে পুনরাবর্ত্তিত হয় কখন বা অদ্ভুত যত ছদ্মরূপে লুক্কায়িত থাকে, তাহারা স্বপ্নে বা জাগ্রতের মধ্যে উঠিয়া দেখা দিতে পারে। এই সমস্ত সংস্কার প্রধানতঃ স্বপ্নে অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধভাবে জাগিয়া উঠে, তবে তাহারা আবার আমাদের জাগ্রত চেতনারও মধ্যে আসিয়া দেখা দিতে পারে ও দেখা দিয়া থাকে—পুরাতন চিন্তার যন্ত্রবৎ পুনরাবৃত্তিরূপে, মন প্রাণ ও জড় স্তরের পুরাতন অভ্যাসরূপে অথবা সেই সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি, কর্ম্মাবলী, ভাবাবেগের প্রচ্ছন্ন প্ররোচকরূপে যাহারা আমাদের জাগ্রত চিন্তা বা ইচ্ছা হইতে উৎসারিত নয়, বরং প্রায়ই ইহাদের প্রতীতির, পছন্দের, আদেশের বিরোধী। অবচেতনায় একটা অস্ফুট অসংস্কৃত মন আছে যাহা আমাদের অতীত জীবনের স্পষ্ট ছবগনের সংস্কাররাজিতে পূর্ণ, একটা অস্ফুট অসংস্কৃত প্রাণ আছে অভ্যাসগত বাসনা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও স্নায়ব প্রতিক্রিয়ার বীজে যাহা পরিপূর্ণ, একটা একান্ত অসংস্কৃত জড়সত্তা আছে যাহা শরীরের অবস্থা সম্পর্কে সব বিষয় অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাই আমাদের

রোগাদির জন্য বহুপরিমাণে দায়ী। পুরাতন অথবা পৌনঃপুনিক রোগাদি বস্তুতঃ এই অবচেতনার দরুণ ঘটিয়া থাকে—শারীর চেতনার উপর যত কিছু ছাপ পড়ে তাহাদের তৎপরেয় স্মৃতি ও পুনরাবৃত্তির অভ্যাস সেই অবচেতনা ধরিয়া রাখে এইজন্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই অবচেতনাকে আমাদের সত্তার অন্তস্থল হইতে—যেমন, আন্তর বা সূক্ষ্ম জড়চেতনা, আন্তরপ্রাণ বা আন্তর মানসচেতনা, এইগুলি হইতে স্পষ্টরূপে পৃথক্ করিয়া দেখিতে হইবে—কারণ ইহারা সকলে আদৌ অস্ফুট বা অসম্বদ্ধ বা বিশৃঙ্খল নহে—আমাদের বহিশ্চেতনার নিকটে অবগুণ্ঠিত মাত্র। আমাদের বাহিরের চেতনা এই সব স্তর হইতে কিছু না কিছু সদা-সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে তাহার কিছুই সে জানে না।

*
* *

এই যে জড়জগৎ আমরা দেখিতেছি ইহার ঊর্দ্ধে একটা (স্বপ্রতিষ্ঠ) প্রাণভূমি আছে, জড় এবং প্রাণভূমির ঊর্দ্ধে আবার আছে (স্বপ্রতিষ্ঠ) মনোভূমি। এই তিনটি —মনোময়, প্রাণময় ও জড়ময় ভূমি—মিলিয়া নিম্নপরার্দ্ধের অন্তর্গত ত্রিলোক নামে অভিহিত। ক্রমবিকাশের ফলে ইহারা পার্থিব চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু বিবর্ত্তনের পূর্ব্বে পার্থিব চেতনার ঊর্দ্ধে এবং পৃথিবী যে

জড় রাজ্যের অন্তর্গত তাহারও ঊর্দ্ধে উহারা আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠ।

*
* *

মানুষের সমগ্র প্রাণপ্রকৃতির পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন ও অচল ভাবে আছে তাহার সত্যকার প্রাণপুরুষ। তাহা বাহ্য প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাহ্য প্রাণ সঙ্কীর্ণ, অজ্ঞ, সীমাবদ্ধ,—মলিন বাসনা, আবেগ, বুভুক্ষা, বিদ্রোহ, সুখদুঃখ, ক্ষণস্থায়ী হর্ষ ও শোক, উল্লাস ও অবসাদে পূর্ণ, পক্ষান্তরে সত্য প্রাণপুরুষ উদার, বৃহৎ, স্থির, শক্তিমান, সীমামুক্ত, দৃঢ় ও অটল—সকল শক্তি, সকল জ্ঞান ও সকল আনন্দের সামর্থ্য তাহার আছে। অধিকন্তু ইহা অহং-শূন্য, কারণ নিজেকে সে ভগবান্ হইতে আবির্ভূত এবং ভগবানের যন্ত্র বলিয়া জানে। ভাগবত যোদ্ধা সে—শুদ্ধ ও সিদ্ধ। সকল দিব্য সিদ্ধি আনিবার জন্য তাহারই মধ্যে আছে সাধিকা শক্তি। এই সত্য প্রাণপুরুষই তোমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে ও সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ সত্যকার মনোময় পুরুষ এবং জড়পুরুষও আছে। ইহারা যখন প্রকট হইবে তখন দেখিতে পাইবে তোমার সত্তাটি দুই ভাগে বিভক্ত। পিছনের সত্তা সর্ব্বদা শান্ত ও শক্তিমান, কেবল বাহিরের সত্তাই সুখদুঃখে বিড়ম্বিত ও আচ্ছন্ন। কিন্তু পশ্চাতের সত্য প্রাণসত্তা যদি অটল থাকে ও তুমি তাহার মধ্যে বাস কর, তাহা হইলে দুঃখকষ্ট ও আচ্ছন্নতা শুধু বাহিরেই

থাকিয়া যায়। যখন এই অবস্থা, তখন অধিকতর শক্তি লইয়া সত্তার বাহিরের অংশসমূহের উপর রাজ করা যায়, ইহাদেরও মুক্ত এবং নির্দ্দোষ করিয়া তুলিতে পারা যায়।

*
* *

"মন" এই শব্দটি সমগ্র চেতনাকেই নির্ব্বিচারে বুঝাইবার জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মানুষ মনোময় জীব, সব-কিছুকে সে একটা মানসরূপ দেয়। কিন্তু আমাদের যোগের পরিভাষায় মন ও মানস শব্দ দুইটি আধারের যে অংশ জ্ঞানবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া, ধারণারাজি লইয়া, মানসিক অথবা চিন্তাগত প্রতীতি, বস্তুরাজির সংস্পর্শে চিন্তার প্রতিক্রিয়া লইয়া, যাহা-সব প্রকৃতই মানসিক গতিধারা ও রূপায়ন, মানসদৃষ্টি ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি লইয়া, বিশেষভাবে সেই অংশকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। প্রাণকে মন হইতে সাবধানে পৃথক্ করিয়া দেখিতে হইবে—যদিও প্রাণের মধ্যে মানসিক একটা উপাদানও নিবিড়ভাবে মিশ্রিত থাকে। প্রাণ হইতেছে জীবন-প্রকৃতি এবং ইহা এই সকল জিনিষে গঠিত :—বাসনা, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, আবেগ, কর্ম্মশক্তি, বাসনাগত সঙ্কল্প, মানুষের অন্তরে বাসনাময় পুরুষের প্রতিক্রিয়া আর অধিকারলিপ্সা এবং প্রকৃতির এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহজাত-বৃত্তির খেলা, যথা ক্রোধ, ভয়, লোভ, কাম প্রভৃতি। বহিশ্চেতনায় মন ও প্রাণ মিশ্রিত হইয়া আছে, কিন্তু ইহারা নিজেরা সম্পূর্ণ

পৃথক্ শক্তি। সাধক বাহিরের চেতনার পিছনে চলিয়া গেলেই উহাদিগকে পৃথক্ রূপে দেখিতে পায়, তাহাদের প্রভেদ বুঝিয়া লইতে পারে এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের বাহ্যিক মিশ্রণকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে। যখন প্রাণের প্রত্যয় জন্মে নাই বা সমর্পণ হয় নাই এবং যখন সে অন্ধভাবে নিজের বাসনা, মত্ত-আবেগ ও সাধারণ-জীবনমুখী আকর্ষণের পথে চলিতে থাকে তখনও মনের পক্ষে ভগবানকে অথবা যোগের আদর্শকে স্বীকার করা সম্পূর্ণ সম্ভব ও স্বাভাবিক—এ ভাবে স্বল্প বা দীর্ঘ কাল, কখন কখন খুবই দীর্ঘ কাল, কাটিতে পারে। এই সাধনায় তীব্রতর সঙ্কট সব যে দেখা দেয় তাহার অধিকাংশের হেতু প্রাণের ও মনের এই বিচ্ছেদ বা সংঘর্ষ।'

*
* *

মনোময় পুরুষ ভিতর হইতে তোমার মধ্যে যাহা কিছু ঘটে তাহা দর্শন করে, পর্য্যবেক্ষণ করে ও বিচার করে। হৃৎ-পুরুষ এইভাবে সাক্ষীর মত দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করে না; কিন্তু তাহার জ্ঞান ও অনুভব স্বতঃস্ফূর্ত্ত, চলে আরো প্রত্যক্ষ জ্যোতির্ম্ময় ধারায়, আপন সত্তার বিশুদ্ধতা ও অন্তঃস্থ দিব্য প্রেরণার বলে। তাই যখনই সে সম্মুখে আসে তৎক্ষণাৎ তোমার স্বভাবের গতিধারার মধ্যে কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা তাহা প্রকাশ করিয়া ধরে।

মানুষের সত্তা এই সব উপকরণে গঠিত :—চৈত্যপুরুষ

—ইহা পিছনে থাকিয়া সমস্তকে ধারণ করিয়া আছে—অন্তর্মন, অন্তঃপ্রাণ, অন্তঃশরীর এবং ইহাদের প্রকাশ-যন্ত্র মন, প্রাণ ও শরীর লইয়া যে সম্পূর্ণ বাহ্য প্রকৃতি। কিন্তু সকলের উপরে হইল মূল বা কেন্দ্রীয় পুরুষ, "জীবাত্মা"; ইহাই আপনার অভিব্যক্তির জন্য অন্য যাবতীয় অঙ্গ সব ব্যবহার করিতেছে। ইহা ভাগবত সত্তার অংশ। কিন্তু বহির্মুখী মানুষের নিকট তাহার নিজের এই সত্যটি প্রচ্ছন্ন। মনের এবং প্রাণের অহংকেই সে অন্তরতম এই সত্তা ও স্বরূপের পরিবর্তে স্থাপন করে। কেবল যাহারা নিজেকে জানিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারাই তাহাদের সত্য মূল-সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে, তবুও এই সত্তা মনপ্রাণশরীরের কর্মের পিছনে সর্ব্বদাই থাকে—ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিভূ হইল চৈত্যপুরুষ, চৈত্যপুরুষও নিজে ভগবানেরই স্ফুলিঙ্গ। সাধকের প্রকৃতির মধ্যে চৈত্য-পুরুষের প্রভাব বিকশিত হইয়া উঠিলে তবে সে তাহার উর্দ্ধের মূল-সত্তার সঙ্গে সজ্ঞান সংস্পর্শে আসিতে থাকে। এই জিনিষটি যখন ঘটে, মূলসত্তা যখন একটা চেতন ইচ্ছা-শক্তির প্রযোগে স্বভাবের গতি নিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থিত করিয়া চলে তখনই যে-আত্মশাসন আংশিক মাত্র এবং কেবল মানসিক বা নৈতিক, তাহার পরিবর্তে সাধক যথার্থ অধ্যাত্ম আত্মশাসন লাভ করে।

*
* *

আমাদের যোগে কেন্দ্রীয় বা "মূল পুরুষ" কথাটি

সাধারণতঃ আমাদের ভিতরে ভাগবত যে অংশটি আর সমস্ত অঙ্গ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহা জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে তাহাকেই বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। এই মূল-পুরুষের দুই রূপ—ঊর্দ্ধে ইহা জীবাত্মা—আমাদের সত্য সত্তা—উচ্চতর আত্ম-জ্ঞান আসিলে আমরা ইহার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া থাকি, নিম্নে ইহা চৈত্যপুরুষ,—মন, প্রাণ, শরীরের পিছনে যাহা বর্ত্তমান। জীবন লইয়া যে অভিব্যক্তি জীবাত্মা তাহার ঊর্দ্ধে অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান, চৈত্যপুরুষ ঐ অভিব্যক্তির পিছনে রহিয়া উহাকে ধারণ করিয়া আছে।

চৈত্যপুরুষের স্বাভাবিক মূল-ভাবটি হইল নিজেকে শিশুরূপে, ভগবানের সন্তানরূপে, ভক্তরূপে অনুভব করা। ভগবানের অংশ সে, তাঁহার সহিত স্বরূপতঃ এক, কিন্তু অভিব্যক্তির কর্ম্মবিধানে এই একত্বের মধ্যেও আছে একটা পার্থক্য। পক্ষান্তরে, জীবাত্মা ঐ স্বরূপেরই মধ্যে বাস করে এবং ভগবানের সহিত এক হইয়া মিশিয়া যাইতে পারে। জীবাত্মাও কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সৃষ্টিলীলার অধিষ্ঠাতা হইয়া দাড়ায় সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে অনেকধা ভগবানের একটি কেন্দ্ররূপে জানে—পরমেশ্বররূপে নহে। এই পার্থক্য স্মরণে রাখা প্রয়োজন, নতুবা প্রাণস্তরের ক্ষীণতম অহংভাবও যদি থাকে তবে সাধক নিজেকে অবতারকল্প বলিয়া মনে করিতে পারে অথবা রামকৃষ্ণের স্পর্শে হৃদয়ের যেরূপ হইয়াছিল সেই রকম অপ্রবৃতিস্থ হইয়া পড়িতে পারে।

* * *

যাহা আত্মা তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই মূল নিরুপাধিক ভগবান্‌।

অদ্বিতীয় ভগবান্‌ যখন আপন অন্তঃস্থ নিত্যকার বহুত্বকে ব্যক্ত করেন তখন এই মূল-সত্তা বা আত্মা সেই অভিব্যক্তির কেন্দ্রগত পুরুষ হইয়া ঊর্দ্ধ হইতে ইহার যাবতীয় ব্যক্তিরূপ ও পার্থিব জন্মসমূহের বিবর্ত্তনের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। কিন্তু স্বরূপতঃ উহা পার্থিব অভিব্যক্তির পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান, ভগবানের এক সনাতন অংশ—"পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা"।

নিম্নতর অভিব্যক্তির মধ্যে, অপরা প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের এই সনাতন অংশ অন্তরাত্মারূপে, ভগবদগ্নির স্ফুলিঙ্গরূপে আবিভূত হয়, ব্যষ্টির বিবর্ত্তনকে—তাহার মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় সত্তাকে ধারণ করিয়া থাকে। চৈত্যপুরুষ এই স্ফুলিঙ্গ, ইহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া অগ্নিতে পরিণত হয়, চেতনা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ত্তিত হইতে থাকে। সুতরাং চৈত্যপুরুষ বিবর্ত্তনশীল—জীবাত্মার মত বিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে।

মানুষ কিন্তু আত্মা বা জীবাত্মা সম্বন্ধে সচেতন নহে। সে জানে কেবল তাহার অহংকে অথবা সে জানে তাহার দেহ ও জীবনের নিয়ামক মনোময় পুরুষকে। কিন্তু আরো গভীর স্তরে পৌঁছিলে সে তাহার অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষকে তাহার সত্যকেন্দ্র—হৃদয়পুরুষ—বলিয়া

জানিতে পারে। বিবর্তনের ক্ষেত্রে চৈত্যপুরুষই মূল সত্তা, ভগবানের সনাতন অংশ জীবাত্মা হইতে ইহার উদ্ভব এবং সে জীবাত্মারই প্রতিভূ। চেতনার পূর্ণতায় জীবাত্মা ও চৈত্যপুরুষ সম্মিলিত হয়।

অহংকার প্রকৃতির এক রূপায়ন, তবে ইহা কেবলই জড়প্রকৃতির রূপায়ন নহে, সুতরাং শরীরের সঙ্গে ইহা বিনষ্ট হয় না। মনোময় এবং প্রাণময় অহংকারও আছে।

পৃথিবীতে জড়চেতনার মূলে শুধু অজ্ঞান নয়, নিশ্চেতনাও আছে, অর্থাৎ চেতনা এখানে জড় রূপের ও জড় শক্তির মধ্যে অন্তর্লীন। শুধু জড়চেতনা নহে, প্রাণময় এবং মনোময় চেতনাও অজ্ঞানতার দ্বারা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন।

সংস্কৃতজাত ভাষায় জীব শব্দটির দুই অর্থ—সৃষ্ট প্রাণী* এবং জন্মজন্মান্তরে বিবর্তনের মধ্য দিয়া সজীব সত্তাটিকে ধারণ করিয়া থাকে যে ব্যষ্টিরূপী আত্মা। শেষোক্ত অর্থে সম্পূর্ণ শব্দটি হইল জীবাত্মা—জীবের আত্মা বা শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তা। গীতায় রূপকচ্ছলে ইহা "ভগবানের

---

* বাংলায় ক্ষুদ্র কোন প্রাণীর কেহ প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইলে লোকে প্রায়ই প্রতিবাদচ্ছলে বলিয়া থাকে—"মেরো না, ও যে কৃষ্ণের জীব"।

সনাতন অংশ” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু (তোমার ব্যবহৃত) ভগ্নাংশ শব্দটি মাত্রাতিরিক্ত হইয়া পড়ে; বাহ্যরূপাবলী সম্বন্ধে উহার প্রয়োগ চলিতে পারে, কিন্তু তাহাদের ভিতরের সত্তাটি সম্বন্ধে নহে। অধিকন্তু ভগবানের বহুভাব চিরন্তন সত্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাহা বিদ্যমান। জীবাত্মার বিস্তৃত বর্ণনা তবে হইবে এই: “সৃষ্ট প্রাণীর ব্যষ্টিভূত আত্মারূপে বা অধ্যাত্মসত্তারূপে প্রকটিত বহুভাবাত্মক ভগবান্”। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরিবর্ত্তিত বা বিবর্ত্তিত হয় না—ইহার স্বরূপ ব্যক্তিগত বিবর্ত্তনের উর্দ্ধে অবস্থিত। বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে বিবর্ত্তনশীল চৈত্যপুরুষ ইহার প্রতিভূ—প্রকৃতির অন্যান্য অংশের ধারয়িতা।

অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে জীবের বাস্তব কোন সত্তা নাই, কারণ ভগবান্ অবিভাজ্য। অপর এক সম্প্রদায়ের মতে জীবের বাস্তব সত্তা আছে বটে, কিন্তু সে সত্তা স্বতন্ত্র নহে—ইহারা বলেন জীব ভগবানের সহিত মূলতঃ এক, তবে লীলার মধ্যে ভগবান্ হইতে পৃথক্ এবং যেহেতু লীলা সত্য ও সনাতন, ভ্রান্তিমাত্র নহে, সেহেতু তাহাকে মিথ্যা বলা যায় না। দ্বৈতবাদ সকল বলে যে জীব স্বাধীন স্বতন্ত্র এক তত্ত্ব—ভগবান, জীব ও প্রকৃতি এই ত্রয়ীর উপর তাহাদের প্রতিষ্ঠা।

* *

পুরুষ প্রতিবার জন্মগ্রহণ করে এবং প্রতিবারই তাহার

অতীত বিবর্তন ও ভবিষ্যৎ প্রযোজন অনুসারে বিশ্বপ্রকৃতির উপাদান হইতে নূতন মন, প্রাণ এবং দেহ গঠিত হয়।

দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়া গেলে প্রাণসত্তা প্রাণভূমিতে চলিয়া যায় ও কিছুকাল সেখানে অবস্থান করে, সময়ে আবার সেই প্রাণকোষও অন্তর্হিত হয়। সকলের পরে হয় মনোময় কোষের বিলয়। অবশেষে অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ চৈত্যজগতে প্রবেশ করে ও নূতন এক জন্ম আসন্ন হওয়া অবধি সেখানে বিশ্রাম করে।

যে সকল মানুষের সাধারণ ধারায় আত্মবিকাশ হইয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহাই মোটামুটি পথ। ব্যক্তি হিসাবে মানুষের প্রকৃতি ও বিকাশমাত্রা অনুযায়ী ইহার ভারতম্যও হয়। যেমন, মনের যদি সুদৃঢ় বিকাশ হইয়া থাকে তাহা হইলে মনোময় পুরুষ বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে, সেইরূপ প্রাণসত্তাও থাকিয়া যাইতে পারে, যদি অবশ্য ইহারা সত্য চৈত্যপুরুষের দ্বারা সুসংহত হয় ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই অবস্থান করে, চৈত্যসত্তার অমরত্ব তাহারাও লাভ করে।

পুরুষ জীবনের অভিজ্ঞতারাজির সারাংশ আহরণ করিয়া চলে এবং বিবর্ত্তনের ধারায় উহাকেই আত্মবিকাশের ভিত্তি করিয়া লয়। পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে উহা স্বীয় মনোময়, প্রাণময় ও শারীর কোষ পরিগ্রহের সময় ততখানি কর্ম্মও সঙ্গে লইয়া থাকে যতখানি নূতন জীবনে পূর্ণতর অভিজ্ঞতার জন্য তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়।

বস্তুতঃ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সত্তার প্রাণময় অংশের জন্যই

অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই পৃথিবী অথবা প্রাণস্তরের জগৎসমূহের দিকে প্রাণস্তরের যে সব স্পন্দন তখনো তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে সে সব হইতে মুক্তিলাভের সহায়তার জন্য এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান—যাহাতে চৈত্য জগতের শান্তির মধ্যে সত্বর উত্তীর্ণ হইয়া সে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে।

*
* *

ব্যষ্টিগত চেতনা বাহিরের বিশ্বচেতনায় প্রসারিত হইয়া তাহার সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার গতিবিধি সব জানিতে পারে, তাহার উপর কাজ করিতে, তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারে, এমন কি তাহার সহিত সমায়তন হইতে অথবা তাহাকে আপনার মধ্যে ধারণও করিতে পারে—এই কথাটি বুঝাইতে প্রাচীন যোগের ভাষায় বলা হইত যে ব্রহ্মাণ্ড তোমার ভিতরে তুমি অনুভব করিতেছ।

বিশ্বচেতনা হইল ব্রহ্মাণ্ডের চেতনা—বিশ্বপুরুষের এবং যাবতীয় সত্তা ও শক্তিসহ বিশ্বপ্রকৃতির চেতনা। ব্যষ্টি স্বতন্ত্রভাবে যেমন চেতন, এই সমস্ত সমষ্টিরূপেই তেমনি চেতন—যদিও ভিন্ন ধারায়। ব্যষ্টির চেতনা এই বিশ্ব-চেতনারই অংশ—তবে সে-অংশ নিজেকে পৃথক্ সত্তারূপে অনুভব করে। তথাপি যাহা কিছু লইয়া সে গঠিত তাহার বেশির ভাগ বিশ্বচেতনা হইতেই সর্ব্বদা তাহার

মধ্যে আসিয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে উভয়কে পৃথক্ করিয়া আছে এক অজ্ঞানতার প্রাচীর। একবার যদি ইহা ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে ব্যষ্টিসত্তা বিশ্ব-আত্মা সম্বন্ধে, বিশ্বপ্রকৃতির চেতনা সম্বন্ধে, ইহার অভ্যন্তরে ক্রিয়মান শক্তিরাজি প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে জড়পদার্থ ও ইহাদের অভিঘাত সে যেরূপ অনুভব করে ঐ সমস্ত বস্তুকে ঠিক সেই প্রকারেই তখন অনুভব করিয়া থাকে—সে দেখে সব জিনিষই তাহার নিজের বৃহত্তর বা বিশ্বব্যাপী আত্মার সহিত একীভূত।

বিশ্বব্যাপী মনঃপ্রকৃতি আছে, বিশ্বব্যাপী প্রাণপ্রকৃতি আছে এবং বিশ্বব্যাপী জড়প্রকৃতিও আছে। ইহাদেরই শক্তিরাজি ও গতিধারা হইতে কতক নির্ব্বাচিত করিয়া ব্যষ্টিগত মন, ব্যষ্টিগত প্রাণ ও ব্যষ্টিগত জড়প্রকৃতি গঠিত হয়। মন প্রাণ ও দেহ লইয়া এই যে প্রকৃতি তাহার বাহির হইতে আসিয়াছে চৈত্যপুরুষ। ইহা বিশ্বাতীতেরই অঙ্গ এবং এই চৈত্যপুরুষ আছে বলিয়াই উর্দ্ধতন দিব্য-প্রকৃতির দিকে আমরা নিজেদের উন্মুক্ত করিতে পারি।

ভগবান এক হইয়াও বহু। এক-অদ্বিতীয়ের যে "বহুত্বে"র দিক তাহারই অংশ হইল ব্যষ্টি-আত্মা আর এই ব্যষ্টি-আত্মা পৃথ্বী-প্রকৃতির মধ্যে ক্রম-বিবর্ত্তিত হইবার জন্য আপনার যতখানি প্রকট করেন তাহাই চৈত্যপুরুষ। মুক্তির অবস্থায় ব্যষ্টি-আত্মা নিজেকে সেই এক-অদ্বিতীয় (যাহা আবার বহু) বলিয়া উপলব্ধি করে। এই একের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিতে, বিলীন করিয়া

দিতে অথবা তাহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারে—ইহাই অদ্বৈতবাদের লয়, এই ব্যষ্টি-আত্মা ভগবানের সহিত নিজের একত্ব অনুভব করিতে পারে, সেই সাথেই আবার যিনি এক হইয়াও বহু তাঁহার অংশরূপে তাহাকে সম্ভোগও করিতে পারে—ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত মুক্তি, আবার ব্যষ্টি-আত্মা ভগবানের সত্তার যে দিক তাহাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া শাশ্বত বৃন্দাবনে ভগবান্ কৃষ্ণের লীলাসাথী হইয়া থাকিতে পারে—ইহাই দ্বৈত মুক্তি। অথবা মুক্ত হইয়াও ব্যষ্টি-আত্মা ভগবানের জাগতিক লীলা বা প্রকাশের মধ্যে অবস্থান করিতে পারে, কিম্বা যতবার ইচ্ছা তাহার মধ্যে অবতরণ করিতে পারে। মানুষের দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা ভগবান্ আবদ্ধ নহেন। ভগবান্ সর্ব্বথা মুক্ত—লীলায় এবং স্বরূপতঃ।

যাহাকে আমরা প্রকৃতি বলি তাহা জগৎসমূহের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা চিৎশক্তির বাহ্যতম বা কার্য্যনির্ব্বাহক রূপ। এই বাহ্যতম রূপটি এখানে স্থূলক্ষেত্রে যন্ত্রের মত দেখা যায়, তাহা বিভিন্ন শক্তিরাজির, গুণত্রয় প্রভৃতির লীলা মাত্র। কিন্তু ইহার পিছনে আছে ভগবানের জাগ্রত চৈতন্য ও শক্তি—ভাগবতী শক্তি। প্রকৃতি নিজে নিম্নতর ও উর্দ্ধতর রূপে দ্বিধা বিভক্ত। নিম্নতর প্রকৃতি অবিদ্যাপ্রকৃতি—মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময়—তাহার চেতনা ভগবৎ-চেতনা হইতে বিচ্ছিন্ন। উর্দ্ধতন প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময়ী

দিব্যপ্রকৃতি ; ইহার আছে সৃষ্টিক্ষম বিজ্ঞানশক্তি—ভাগবত চেতনা তাহার সর্ব্বদা রহিয়াছে, অবিদ্যা ও তাহার পরিণামরাজি হইতে সে চিরমুক্ত। মানুষ যতদিন অবিদ্যার মধ্যে থাকে, ততদিন সে নিম্নতন প্রকৃতির অধীন, কিন্তু অধ্যাত্ম বিবর্ত্তনের দ্বারা ঊর্দ্ধতন প্রকৃতি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহে। ঊর্দ্ধতন প্রকৃতির মধ্যে সে আরোহণ করিতে পারে, ঊর্দ্ধপ্রকৃতিও তাহার মধ্যে অবতরণ করিতে পারে। এই আরোহণ ও অবতরণের ফলে মন, প্রাণ ও জড়দেহ লইয়া যে নিম্নপ্রকৃতি তাহা রূপান্তরিত হইতে পারে।

*
* *

বিজ্ঞানের অবতরণ আদৌ সম্ভবপর হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে অধিমানসে উত্তীর্ণ হওয়া এবং তাহাকে নামাইয়া আনা প্রয়োজন—কেননা অধিমানসই মন হইতে বিজ্ঞানে আরোহণের মধ্যবর্ত্তী পথ।

অধিমানসই সৃষ্টিক্ষম সত্যের এই যে সমস্ত বিভিন্ন বিন্যাস তাহাদের উদ্ভবস্থল। অধিমানসের মধ্য হইতে তাহারা সাক্ষাৎজ্ঞানে (সম্বোধিতে) নামিয়া আসে ও তথা হইতে জ্যোতির্ম্ময় এবং ঊর্দ্ধতন মনে সঞ্চারিত হয় এবং সেখানে আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হইবার জন্য বিন্যস্ত হইতে থাকে। তবে নিম্নতর স্তর সমূহে যেমন তাহারা অবতরণ করে, সেই ক্রমান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উত্তরোত্তর নিজেদের শক্তি ও দৃঢ়-নিশ্চয়তা হারাইয়া ফেলে।

সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য তাহাদের যতখানি, মানবমনে আসিয়া তাহা নষ্ট হইয়া যায়, কারণ, মানবীয় বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাহারা জল্পনামূলক চিন্তা-মাত্ররূপে উপস্থিত হয়—উপলব্ধ সত্যরূপে নহে বা অপরোক্ষদৃষ্টিরূপে বা জাগ্রত নিঃসংশয় অনুভূতির সহিত যুক্ত ওজস্বান্ সাক্ষাৎ-দর্শন রূপে নহে।

*
* *

অতিমানস (বিজ্ঞান) রহিয়াছে সচ্চিদানন্দ ও নিম্নতন সৃষ্টির মধ্যস্থলে। ভাগবত চৈতন্যের আত্ম-নিয়ামক সত্য আছে শুধু বিজ্ঞানেরই মধ্যে। সত্যময় সৃষ্টির জন্য ইহার প্রয়োজন।

সাধক মন, প্রাণ ও শরীরের স্তর হইতেও সচ্চিদা-নন্দের অনুভূতি লাভ করিতে পারে। তবে সে-ক্ষেত্রে তাহা স্থিতিমুখী, আপন অস্তিত্বের দ্বারা নিম্নপ্রকৃতিকে ধারণ করিয়া থাকে মাত্র, তাহাকে রূপান্তরিত করে না। একমাত্র অতিমানস বিজ্ঞানই নিম্নপ্রকৃতির রূপান্তর সাধন করিতে সক্ষম।

*
* *

সচ্চিদানন্দ এক-অদ্বিতীয় হইয়াও ত্রয়ী। পরমের মধ্যে এই তিনটি তিন নয়, কিন্তু এক—সেখানে যাহা সৎ তাহা চৈতন্য, আর যাহা চৈতন্য তাহাই আনন্দ—এইভাবে তাহারা অচ্ছেদ্য, শুধু অচ্ছেদ্য নয় পরস্পর এতখানি

একীভূত যে তাহাদের পার্থক্য আদৌ নির্দ্দেশ করা যায় না। সৃষ্টি-প্রকাশের উর্দ্ধতন লোকসমূহে অবিচ্ছেদ্য হইলেও তাহারা ত্রিবৃৎ এবং এই তিনের এক একটিকে অন্যান্যের অপেক্ষা প্রধান, অন্যান্যের প্রতিষ্ঠা, পুরোধা করিয়া ধরা যাইতে পারে। সৃষ্টির নিম্নতন লোকসমূহে, তাহাদের নিগূঢ় সত্য-সত্তায় না হইলেও, দৃশ্যতঃ তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং ব্যবহারিক ভাবে একে অন্য ব্যতিরেকেও অবস্থান করিতে পারে। ইহারই ফলে আমাদের প্রত্যয় হয় যেন নিশ্চেতন বা দুঃখময় সত্তা অথবা আনন্দহীন চেতনা বলিয়া কিছু আছে। বস্তুতঃ ব্যবহারিক অনুভূতিতে যদি তাহাদের এই বিচ্ছেদ না থাকিত তবে দুঃখ, অজ্ঞান, মিথ্যা, মৃত্যু এবং যাহাকে আমরা নিশ্চেতনা বলি, এ সব-কিছুই নিজেদের প্রকট করিতে পারিত না—জড়ের বিশ্বব্যাপী নির্জ্ঞান হইতে সসীম এবং ব্যষ্টিনিষ্ঠ চেতনার এই বিবর্ত্তনও সম্ভবপর হইত না।

আত্মসমর্পণ ও আত্মোন্মীলন

এই যোগের সমগ্র মূলসূত্র হইতেছে একমাত্র ভগবানেরই কাছে আপনাকে নিঃশেষে অর্পণ করা—অন্য কাহারও কাছে বা অন্য কিছুর কাছে নয়, এবং ভাগবতী জননীর সহিত ঐক্যের ফলে আমাদের মধ্যে অতিমানস ভাগবত সত্তার সমগ্র পরাজ্যোতি, শক্তি, প্রসারতা, শান্তি, পবিত্রতা, সত্যাত্মক চেতনা ও আনন্দ নামাইয়া আনা।

*
* *

ঊর্দ্ধতম অধ্যাত্মসত্তা হইতে শারীর স্তর পর্য্যন্ত আধারের সমুদয় অংশে ভগবানের প্রতি যে অখণ্ড ও সর্ব্বাঙ্গীণ প্রেম, যাহার ফল পূর্ণতম আত্মসমর্পণ ও সমস্ত সত্তার সম্পূর্ণ উৎসর্গ, যাহা শরীর ও স্থূলতম জড়প্রকৃতির মধ্যে পরম অধ্যাত্ম আনন্দ নামাইয়া আনে, সেই পূর্ণতম প্রেমের মূর্ত্তি রাধা।

*
* *

কেবল ভাগবত প্রভাব ব্যতীত অন্য কোন প্রভাব গ্রহণ না করার নাম শুচিতা।

*
* *

নিষ্ঠা হইতেছে ভগবৎ-প্রণোদিত এবং ভগবৎ-চালিত

প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তিকে বাহির হইতে আসিতে কি ভিতর হইতে প্রকাশ পাইতে না দেওয়া।

*
* *

ঐকান্তিকতার অর্থ সত্তার সমুদয় গতিবিধিকে পূর্ব্বলব্ধ চেতনা ও উপলব্ধির সর্ব্বোচ্চ স্তরে তুলিয়া ধরা।

মূল ভাগবত ইচ্ছাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র সত্তাকে তাহার সকল অংশে ও সকল ক্রিয়ায় ঐক্যবদ্ধ ও সুসমঞ্জস করিয়া তোলা—ইহাই ঐকান্তিকতার দাবি।

*
* *

ভগবান্ আপনাকে অর্পণ করেন তাহাদেরই কাছে যাহারা আপনাদিগকে নিঃশেষে সর্ব্বাংশে ভগবানকে অর্পণ করে। তাহাদেরই জন্য শান্তি, জ্যোতি, শক্তি, সুখ, মুক্তি, প্রসারতা, জ্ঞানের শিখররাজি, আনন্দের সিন্ধুনিচয়।

*
* *

মৌখিক আত্মসমর্পণ অথবা পূর্ণ আত্মোৎসর্গের একটা ধারণামাত্র বা নিস্তেজ ইচ্ছা থাকিলে চলিবে না। আমূল ও সর্ব্বাঙ্গীণ পরিবর্ত্তনের জন্য একটা প্রবেগ থাকা চাই।

একটা শুধু মানস ভাবকে আশ্রয় করিলেই যে ইহা হয় তাহা নহে। এমন কি প্রচুর আন্তর অনুভূতি থাকিলেও হয় না—যদি বাহিরের মানুষটি যেমনটি ছিল তেমনি থাকিয়া যায়। এই বাহিরের মানুষটিকেই নিজেকে উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে, সমর্পণ করিতে ও

পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। তাহার ক্ষুদ্রতম প্রত্যেকটি চলন, অভ্যাস, কর্ম্ম সমর্পণ করা চাই, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করা চাই, ভাগবত জ্যোতির কাছে তুলিয়া, ব্যক্ত করিয়া ধরা চাই, ভগবৎ শক্তির কাছে উৎসর্গ করা চাই যাহাতে ইহাদের পুরাতন রূপ ও প্রেরণারাজি ধ্বংস হয় ও ভাগবতী জননীর রূপান্তরসাধক চেতনার দিব্য সত্য ও কর্ম্ম আসিয়া তাহাদের স্থান গ্রহণ করে।

*
* *

যদি আত্মসমর্পণে তোমার অসম্মতি থাকে তবে মায়ের দিকে নিজেকে খুলিয়া রাখার কোন আধ্যাত্মিক অর্থ হয় না। যাহারা এই যোগ অভ্যাস করে তাহাদের নিকট আত্মদান বা সমর্পণ দাবী করা হয়, কেননা সত্তার এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান সমর্পণ ব্যতীত লক্ষ্যের সন্নিহিত হওয়াও অসম্ভব। নিজেকে খুলিয়া রাখার অর্থ মাতৃশক্তিকে তোমার মধ্যে কাজ করিবার জন্য আহ্বান করা, ইহার কাছে সমর্পণ না করার অর্থ শক্তিকে তোমার মধ্যে আদৌ কাজ করিতে না দেওয়া বা এই সর্ত্তে দেওয়া যে তোমার ঈপ্সিত ধারায় সে কাজ করিবে—তাহার নিজস্ব ভাগবত সত্যের ধারায় নয়। এই জাতীয় প্ররোচনা সাধারণতঃ কোন প্রতিকূল শক্তি বা মনপ্রাণের কোন অহমাশ্রিত ভাব হইতে আসিয়া থাকে—তাহা ভগবৎ কৃপা বা শক্তিকে চায় বটে কিন্তু আপন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য, তাহা ভাগবত উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য জীবন নিয়োগ করিতে

ইচ্ছুক নহে, তাহার ইচ্ছা ভগবানের নিকট হইতে যাহা কিছু লাভ করা যায় তাহা গ্রহণ করা, নিজেকে ভগবানের কাছে প্রদান করা নহে। পক্ষান্তরে অন্তরাত্মা, আমাদের সত্য সত্তা, ভগবানকেই চাহে এবং তাঁহার নিকট নিজেকে সমর্পণ করিতে শুধু যে ইচ্ছুক তাহা নয়, পরন্তু ইহাতেই তাহার আগ্রহ ও আনন্দ।

এই যোগে সাধককে সর্ব্ববিধ মানসিক আদর্শবাদ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ধারণা ও আদর্শ সমূহ মনেরই জিনিষ, উহারা অর্দ্ধসত্যমাত্র। মনও একটা আদর্শকে শুধুই ধরিয়া থাকিতে পারিলে, আদর্শ-বিলাসের আমোদ উপভোগ করিতে পারিলে সাধারণতঃ সন্তুষ্ট থাকে, অন্যদিকে প্রাণ কিন্তু রহিয়া যায় একই অবস্থায়— অরূপান্তরিত অথবা সামান্যমাত্র পরিবর্ত্তিত এবং তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ। অধ্যাত্ম-অন্বেষু উপলব্ধির অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র আদর্শের কল্পনা লইয়া ব্যস্ত রবে না। আদর্শের কল্পনা নহে, ভাগবত সত্যের সিদ্ধিই সতত তাহার লক্ষ্য—জীবনের অতীতে অথবা জীবনের মধ্যেও। শেষোক্ত ক্ষেত্রে মন ও প্রাণের রূপান্তর আবশ্যক হয় আর এই রূপান্তর ভাগবতী শক্তির — জগন্মাতার হস্তে সমর্পণ ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না।

নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের অনুসন্ধান তাহাদেরই পথ যাহারা জীবন হইতে নিবৃত্ত হইতে চায়। সাধারণতঃ তাহারা আত্মচেষ্টার দ্বারাই প্রয়াস করে—শ্রেষ্ঠতর এক শক্তির কাছে আপনাকে খুলিয়া ধরিয়া নহে অথবা সমর্পণের পথ

ধরিয়া নহে; কারণ, নৈর্ব্যক্তিক সত্তা আমাদের পথ দেখায় বা সাহায্য করে এমন কিছু নহে। এ বস্তুটিতে গিয়া পৌছিতে হয়, আর ইহা প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছে যাহাতে আপন প্রকৃতির ধারা ও শক্তি অনুসারে ইহাকে সে লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে বিশ্বমাতার কাছে নিজেকে খুলিয়া ও সমর্পণ করিয়া সাধক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বা সত্যের অন্য সকল দিকও উপলব্ধি করিতে পারে।

সমর্পণকে অবশ্যই ক্রমে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হয়। কেহ প্রারম্ভ হইতেই পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারে না, সুতরাং সাধক নিজের ভিতর অনুসন্ধান করিলে ইহার অভাব যে দেখিতে পাইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। তবুও এইজন্য সমর্পণের মূলনীতিটি গ্রহণ না করিবার কারণ নাই. প্রকৃতির প্রতি অংশে পর পর এই সমর্পণের নীতি প্রয়োগ করিয়া দৃঢভাবে একস্তর হইতে অন্যস্তরে, ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে ইহাকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

সাধনার প্রথম অবস্থায়—এবং প্রথম বলিতে আমি অল্পকালস্থায়ী কোন অবস্থার কথা বুঝাইতেছি না—চেষ্টা অপরিহার্য্য। সমর্পণ করিতেই হইবে কিন্তু তাহা একদিনে হইবার বস্তু নহে। মনের নিজস্ব ধারণা সব আছে, সে সকলকে সে ছাড়িতে চাহে না। মানবীয় প্রাণ সমর্পণে পরাঙ্মুখ, কেননা প্রথম অবস্থায় যাহাকে সে সমর্পণ বলে তাহা বিশুদ্ধ আত্মদান নহে, তাহার মধ্যে থাকে দাবি।

শারীর চেতনা পাথরের মত নিরেট, সে যাহাকে সমর্পণ বলিয়া অভিহিত করে তাহা প্রায়ই জড়তা ভিন্ন আর কিছু নয়। একমাত্র চৈত্যপুরুষই সমর্পণ কিরূপে করিতে হয় তাহা জানে, তবে চৈত্যপুরুষ সাধারণতঃ সাধনার প্রারম্ভে অনেকখানি অন্তরালে থাকে। চৈত্যপুরুষ যখন জাগ্রত হয় তখন সে সমগ্র সত্তার আশু ও যথার্থ সমর্পণ আনিয়া দিতে পারে, কারণ, সত্তার অবশিষ্ট অংশে বাধাবিঘ্নের উপর তখন দ্রুত কাজ হয় ও সে সব অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রয়াস অপরিহার্য্য। অথবা যতক্ষণ না ভাগবত শক্তি ঊর্দ্ধ হইতে প্লাবনের মত সত্তার মধ্যে নামিয়া আসে, সাধনার ভার নিজে গ্রহণ করে, সাধকের হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতরভাবে স্বয়ং সাধনার কাজ করে ও ব্যক্তিগত প্রয়াসকে ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া আনে ততক্ষণ প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তখনো প্রয়াসের না হইলেও অভীপ্সা ও সতর্কতার প্রয়োজন থাকে—যতক্ষণ না মন, সঙ্কল্প, প্রাণ ও শরীর ভাগবত শক্তির দ্বারা পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতেছে। আমি "মা" নামক গ্রন্থের এক পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে হয়।

পক্ষান্তরে কোন কোন সাধক আরম্ভই করে সর্ব্বাঙ্গীণ সমর্পণের জন্য একটা খাটি ও ওজস্বান সঙ্কল্প লইয়া। কারণ, তাহারা চৈত্যপুরুষের দ্বারাই পরিচালিত অথবা এমন এক স্বচ্ছ সম্বুদ্ধ মানস-সঙ্কল্প দ্বারা চালিত যাহা সমর্পণকে সাধনার নীতি হিসাবে একবার যখন গ্রহণ

করিয়াছে তখন এ বিষয়ে কোন গোলমাল বরদাস্ত করে না, ইহারই নির্দ্দেশে অনুগমন করিতে সত্তার অন্যান্য অংশকে সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত করে। তবে এখানেও চেষ্টা আছে, কিন্তু সে চেষ্টা এতখানি অনায়াস ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার পশ্চাতে একটা বৃহত্তর শক্তির সম্বন্ধে সে এত সচেতন যে সাধক নিজে আদৌ প্রযাস করিতেছে বলিযা প্রায় অনুভবই করে না। পক্ষান্তরে যেখানে মনে ও প্রাণে থাকে স্বৈরতা বজায রাখিবার একটা ইচ্ছা, তাহা দেয স্বাধীন চলন ত্যাগে একটা অনিচ্ছা, সেখানে দ্বন্দ্ব ও চেষ্টা থাকিবেই যতক্ষণ না সম্মুখের যন্ত্র আর পশ্চাতের বা উর্দ্ধের ভাগবত সত্তার মধ্যবর্ত্তী দেযালটি ভাঙ্গিযা যায। সকলের প্রতি নির্ব্বিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে এমন কোন নিযম বাধিযা দেওযা যায না। মানবীয প্রবৃত্তি এত বিভিন্ন রকমের যে সে-সকলকে একটিমাত্র বিশেষ নিযমের অধীনে আনা সম্ভব নয।

একটা অবস্থা আছে যখন সাধক তাহার মধ্যে ভাগবত শক্তির ক্রিযা সম্বন্ধে, অন্ততঃ ক্রিযার ফল সম্বন্ধে সচেতন হয এবং নিজের মানসিক কার্য্যাবলী, প্রাণের চঞ্চলতা বা শারীরিক তম ও জড়তার দ্বারা শক্তির অবতরণে আর সে বাধা ঘটায না। ইহাই ভগবানের দিকে উন্মীলন। সমর্পণই উন্মীলনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু সমর্পণ না হওযা অবধি আস্পৃহা ও অচাঞ্চল্যের সহাযে

কিছুদূর পর্যন্ত এই আত্মোন্মীলন সাধিত হইতে পারে। সমর্পণের অর্থ নিজের মধ্যে যাহা কিছু সে-সমস্ত ভগবানের কাছে উৎসর্গ করা—আমি বা আমার বলিতে যাহা কিছু সব তাঁহাকে অর্পণ করিয়া দেওয়া—নিজস্ব ধারণা, বাসনা, অভ্যাস ইত্যাদির উপর জোর না দেওয়া, পরন্তু এ সকলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র ভাগবত সত্যকে তাহার আপন জ্ঞান, ইচ্ছা ও কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে দেওয়া।

*
* *

সর্ব্বদা ভাগবত শক্তির সহিত যুক্ত থাকিবে। তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল হইতেছে শুধু ইহাই সহজভাবে করা, ভাগবতী শক্তিকে তাহার আপন কার্য্য করিতে দেওয়া। যখনই প্রয়োজন সে শক্তি নিম্ন বৃত্তি-গুলিকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ করিয়া লইবে। অন্য সময়ে সে তোমাকে এ সকল হইতে রিক্ত করিয়া আপনারই দ্বারা তোমায় পূর্ণ করিয়া দিবে। কিন্তু যদি তুমি মনকে নেতৃত্ব করিতে দাও—কি করিতে হইবে সে বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিতে দাও—তাহা হইলে তুমি ভাগবতী শক্তির স্পর্শ হারাইবে, নিম্নতর বৃত্তিরাজি তখন আপন আপন ভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিবে ও সব কিছু বিশৃঙ্খলা ও ভ্রান্ত ক্রিয়ায় পরিণত হইবে।

*
* *

তখনই কেবল হৃৎপুরুষের পূর্ণ উন্মীলন হয় যখন

সাধকের সাধনা প্রাণস্তরের সকল বাসনার মিশ্রণ হইতে মুক্ত হইয়াছে এবং জগন্মাতার কাছে সরল ও ঐকান্তিক আত্মোৎসর্গের সামর্থ্য সে লাভ করিয়াছে। সাধনায় যদি কোনও প্রকার অহংমুখী গতি থাকে কিম্বা উদ্দেশ্যের মধ্যে থাকে ঐকান্তিকতার অভাব—প্রাণের দাবির তাড়নায় যদি যোগাভ্যাস করা হয় অথবা আংশিক কি সমগ্রভাবে কোন অধ্যাত্ম কি অন্যবিধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, গর্ব, আত্মাভিমান চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা ক্ষমতা, পদমর্য্যাদা বা অপরের উপর আধিপত্য লাভের জন্য অথবা যৌগিক শক্তির সাহায্যে প্রাণস্তরের কোন বাসনা পরিপূরণের দিকে ঝোঁক বশতঃ যদি যোগ অভ্যাস করা হয় তবে হৃৎপুরুষ আপনাকে খুলিতে পারে না অথবা কেবল আংশিকভাবে খোলে অথবা কেবল কখন কখন খোলে এবং পুনরায় রুদ্ধ হয়। কারণ, উহা প্রাণের ক্রিয়াবলীর আড়ালে পড়িয়া যায়—প্রাণবৃত্তির শ্বাসরোধকারী ধূম্রজালে অন্তরাগ্নি নিবিয়া যায়। তা ছাড়া, যোগে মনই যদি প্রাধান্য লাভ করে, অন্তঃপুরুষকে অন্তরালে ঠেলিয়া দেয় অথবা ভক্তি কি সাধনার অন্যান্য ধারা যদি অন্তঃপুরুষের রূপায়ন অপেক্ষা প্রাণের রূপায়নই প্রধানতঃ গ্রহণ করে তাহা হইলেও ঐ একই অসামর্থ্য থাকিয়া যায়। শুচিতা, সরল আন্তরিকতা, এমন অহংশূন্য অবিমিশ্র আত্মোৎসর্গের সামর্থ্য যাহাতে কপটতা নাই, দাবি নাই—এই রকম ক্ষেত্রেই হৃৎপুরুষের পূর্ণ উন্মেষ সম্ভব।

*
* *

হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া তোলা এই যোগের কোন অঙ্গ নহে—তবে হৃদয়াবেগ-সমূহকে ভগবদভিমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। স্বল্প-সময়-বিশেষের জন্য হৃদয় স্তব্ধ হইয়া, সাধারণ অনুভবাদি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, উর্দ্ধ হইতে অন্তঃপ্রবাহের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু এই রকম অবস্থা নীরবতা ও শান্তির অবস্থা—শুষ্কতার নহে। বস্তুতঃ যে অবধি চেতনা উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে সে অবধি এই যোগে হৃদয়কে একাগ্রতার প্রধান কেন্দ্র হইতে হইবে।

*
* *

সাধনায় সর্ব্ববিধ আসক্তিই বাধা। সকলের জন্য তোমার মঙ্গলেচ্ছা থাকিবে—সকলের জন্য অন্তরাত্মার সহৃদয়তা থাকিবে—কিন্তু প্রাণের কোন আসক্তি নহে।

*
* *

সাধকের ভালবাসা হইবে ভগবানের জন্য। এই প্রেমে যখন সে পরিপূর্ণ তখনই সে প্রকৃতভাবে অপরকে ভালবাসিতে পারে।

*
* *

সাধক যেমন প্রাণ, হৃদয় ও শরীরের ভিতর দিয়া অধ্যাত্মকে গ্রহণ করে সেইরূপ বিচারশীল মনের দ্বারাও সে-বস্তু কেন গ্রহণ করিবে না তাহার কোন কারণ নাই।

উহাদের মতনই চিন্তাধর্ম্মী মনেরও গ্রহণ-সামর্থ্য আছে এবং অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় ইহারও যখন রূপান্তর সাধন করিতে হইবে তখন ইহাকে গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন নতুবা এই অঙ্গের কোন রূপান্তর হইতে পারিবে না।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন সাধারণ বুদ্ধির ক্রিয়াই অধ্যাত্ম-অনুভূতির অন্তরায়, ঠিক যেমন প্রাণের সাধারণ অসংস্কৃত ক্রিয়াবলী অথবা তিমিরাচ্ছন্ন নির্ব্বোধের মত বাধা দেয় যে শারীর চেতনা হইল অন্তরায়। বুদ্ধির যত ভ্রান্ত প্রক্রিয়া তাহাদের মধ্যে যেগুলির সম্বন্ধে সাধককে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা হইতেছে, প্রথমতঃ মানস ধারণা ও সংস্কার বা বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তকে অধ্যাত্ম উপলব্ধি বলিয়া ভুল করা, দ্বিতীয়তঃ স্মরণে রাখা, নিজস্ব মনেরই যে চঞ্চল ক্রিয়াশীলতা তাহা চৈত্য ও অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত যাথার্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করে এবং সত্যকার জ্যোতিষ্কর জ্ঞানের অবতরণে সুযোগ দেয় না অথবা মানবীয় মনোভূমি স্পর্শ করিবামাত্র কিম্বা সম্পূর্ণভাবে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সে জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া দেয়। তদব্যতিরেকে বুদ্ধির স্বাভাবিক দোষ ত্রুটি ত আছেই—জ্যোতির্ম্ময় গ্রহণশীলতা এবং প্রশান্ত জ্ঞানোজ্জ্বল বিচারণার পরিবর্ত্তে নিষ্ফল সংশয়ের দিকে তাহার প্রবণতা, নিজের ঊর্দ্ধে, নিজের অজ্ঞাত, নিজের অগম্য গভীর বস্তুকে আপনার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার সব মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করিবার উদ্ধত দাবি; অতিভৌতিককে ভৌতিকের দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস অথবা শুধু জড় ও জড়াশ্রিত মনেরই ক্ষেত্রে

প্রযুজ্য যে প্রমাণ তাহার দ্বারা উচ্চতর ও প্রচ্ছন্ন বস্তু সব প্রমাণিত করিতে হইবে এই দাবি—এবং এমন আরো অনেক কিছু যাহা অতিবাহুল্যের জন্য এখানে বিবৃত করা সম্ভব নহে। সত্যই এই বৃত্তিটি আপনার প্রতিকল্পনা, রচনা, অভিমতকে প্রকৃত জ্ঞানের আসনে স্থাপন করিতেছে, কিন্তু বুদ্ধি যদি সমর্পিত হয়, উন্মুক্ত, প্রশান্ত, গ্রহণশীল হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা উদ্ধস্থ জ্যোতি কেন গ্রহণ করা যাইবে না অথবা অধ্যাত্ম অবস্থা সব অনুভূতিগম্য করিবার এবং আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন পূর্ণ করিয়া তুলিবার পক্ষে সহায় সে হইবে না তাহারও কোন কারণ নাই।

*
* *

মানসিক (তর্কবুদ্ধি জাত) ক্রিয়াকর্মের বিক্ষোভ, প্রাণের ক্ষেত্রে বাসনার ক্রিয়াকর্মের মত, শান্ত করিতে হইবে যাহাতে স্থিরতা ও শান্তি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। জ্ঞান চাই কিন্তু তাহা আসিবে উর্দ্ধ হইতে। এই স্থিরতার মধ্যে মনের সাধারণ কর্ম্মাবলী প্রাণের সাধারণ কর্ম্মাবলীর মত বাহিরে বাহিরেই চলিতে থাকে— ইহাদের সাথে নিস্তব্ধ আন্তর সত্তার কোন যোগ থাকে না। সত্য জ্ঞান ও সত্য প্রাণক্রিয়া যাহাতে অজ্ঞানাশ্রিত কর্ম্মকে রূপান্তরিত করিতে বা তাহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য এই মুক্তি অবশ্য-প্রয়োজন।

*
* *

ভাগবত সত্যের সঙ্গে অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে কিন্তু মানুষের মধ্যে মন, প্রাণপুরুষ এবং জড়প্রকৃতির দ্বারা সে চৈত্যপুরুষ আবৃত। সাধক যোগাভ্যাস করিয়া মন ও বুদ্ধির মধ্যে নানা প্রকার জ্ঞানের আলো পাইতে পারে, শক্তি জয় করিয়া প্রাণ-স্তরে সকল প্রকার অনুভূতির বিলাসে মগ্ন থাকিতে পারে, বিস্ময়কর শারীর সিদ্ধিসমূহও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, কিন্তু পিছনের সত্য অন্তঃপুরষের শক্তি যদি প্রকাশিত না হয়—যদি চৈত্যপ্রকৃতি সম্মুখে না আসে—তবে খাঁটি কিছুই করা হইল না। এই যোগে চৈত্যপুরুষই প্রকৃতির অন্যান্য অঙ্গকে সত্য বিজ্ঞানময় জ্যোতির দিকে এবং সর্ব্বশেষে পরম আনন্দের দিকে খুলিয়া ধরে। মন আপন চেষ্টায় আপনারই ঊর্দ্ধতর স্তর সমূহের কাছে আপনাকে খুলিতে পারে, নিজেকে স্তব্ধ করিয়া নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারে, নিশ্চল কোন মুক্তির বা নির্ব্বাণের মধ্যে অধ্যাত্মভাব লাভ করিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানময় সত্তার পক্ষে মাত্র অধ্যাত্মভাবাপন্ন মন পর্য্যাপ্ত ভিত্তি নহে। যদি অন্তরতম সত্তা জাগ্রত হয়, মনপ্রাণ ও জড়প্রকৃতি হইতে উঠিয়া সত্তার যদি চৈত্য-পুরুষের চেতনায় নবজন্ম লাভ হয়, তবেই এই যোগের সাধনা সম্ভব হইতে পারে, নতুবা (কেবলমাত্র মন বা অপর কোন স্তরের শক্তির দ্বারা) ইহা অসম্ভব। ...

বুদ্ধিগত জ্ঞানের বা মানস ধারণাবাজির বা কোন প্রকার প্রাণজ বাসনার প্রতি আসক্তি হেতু চৈত্যসত্তায় নবজন্ম

গ্রহণ করিতে বা জগন্মাতার নবজাত সন্তান হইতে যদি অস্বীকার করা হয় তবে এই সাধনায় বিফলতা আসিবে।

*
* *

আমি তোমাকে বলিয়াছি শান্তি ও নীরবতা আসিতে পারে এক অব্যর্থ উপায়ে—তাহা হইল উপর হইতে উহাদের অবতরণ। ফলতঃ উহারা ঐ ভাবেই সর্ব্বদা আসিয়া থাকে—যদিও সর্ব্বদা বাহ্যতঃ সে রকম দেখায় না; সকল সময় বাহ্যতঃ সে রকম দেখায় না, কারণ, সকল সময়ে কাজের প্রণালী সম্বন্ধে সাধক সচেতন নয়। সাধক অনুভব করে শান্তি তাহার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, কিম্বা অন্ততপক্ষে প্রকাশিত হইতেছে—কিন্তু কি উপায়ে, কোথা হইতে তাহা যে আসিল সে জ্ঞান তাহার হয় নাই। তবুও ইহাই সত্য যে ঊর্দ্ধতর চেতনার যাহা কিছু তাহা আসে ঊর্দ্ধ হইতে—আধ্যাত্মিক শান্তি নীরবতা কেবল নয়, জ্যোতি শক্তি জ্ঞান, ঊর্দ্ধতর দৃষ্টি ও চিন্তা, আনন্দ ঊর্দ্ধ হইতেই আসিয়া থাকে। অবশ্য এ সব বস্তু কতকদূর অবধি ভিতর হইতেও আসিতে পারে—তবে তার কারণ, অন্তঃপুরুষ সাক্ষাৎভাবে উহাদের দিকে আপনাকে উন্মুক্ত রাখিয়াছে, অন্তঃপুরুষেরই মধ্যে তাই প্রথমে উহারা দেখা দেয়, আর অন্তঃপুরুষ হইতে অথবা অন্তঃপুরুষ যখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখন, উহারা আধারের অন্যান্য অংশে আবির্ভূত হয়। যোগসিদ্ধির দুইটি অমোঘ প্রক্রিয়া—এক, ভিতর হইতে উদ্‌ঘাটন, আর, উপর হইতে অবতরণ।

বাহ্য, ভাসমান মন বা হৃদযাবেগের প্রযাস, কি কোন প্রকাব তপশ্চর্য্যা ঐ সব জিনিষের কিছু কিছু যেন গড়িযা তুলিতেছে মনে হইতে পাবে—কিন্তু যে দুটি অভ্রান্ত পদ্ধতিব কথা বলিলাম তাহাদের ফলের তুলনায এ সকলের ফল অনিশ্চিত ও অসম্পূর্ণ। এই কাবণেই আমাদের যোগ-সাধনায "আত্মোন্মীলনেব" উপব সর্ব্বদা আমবা জোব দিযা থাকি—এক, ভিতবের দিকে, আন্তর মনপ্রাণদেহকে আমাদেব অন্তবতম অংশের, চৈত্যপুরুষের দিকে উন্মীলিত কবা, আর এক, উপবেব দিকে, মনের উর্দ্ধে যে বস্তু তাহাব দিকে উন্মীলিত কবা—সাধনায় ফল লাভ কবিতে হইলে এ দুটি অপবিহার্য্য।

কেন, তাহাব মূল কথা এই—এই যে ক্ষুদ্র মন-প্রাণদেহকে আমবা "আমি" বলি তাহা বহিস্তলেব বৃত্তি মাত্র, আমাদেব প্রকৃত "আমিত্ব" তাহা আদৌ নয। উহা একটি বাহ্য ব্যক্তিত্ব-খণ্ডমাত্র—আমাদেব ক্ষণস্থাযী একটি জীবনকালের জন্য, অজ্ঞানের লীলাব জন্য উহাকে সম্মুখে আনিযা স্থাপন কবা হইযাছে। উহাব সম্বল প্রথমতঃ এক অজ্ঞান মন—সত্যের ভগ্নাংশের অনুসন্ধানে যে চলিযাছে স্খলিতপদে, দ্বিতীযতঃ এক অজ্ঞান প্রাণ—সুখের ভগ্নাংশের অনুসন্ধানে যে ইতস্ততঃ ধাবমান, তৃতীয়তঃ এক তমোময, অধিকাংশই অবচেতন দেহ—বাহ্য বস্তুব সংঘাত যাহাব উপব আসিযা পড়িতেছে এবং তদ্‌জাত একটা সুখ বা দুঃখকে সে কেবল সহ্য কবিযা যাইতেছে কিন্তু আযত্তাধীন কবিতে পাবিতেছে না। এই

সমস্তই আমরা স্বীকার করিয়া চলি, যতদিনে না মন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে, আপনার ও অপর জিনিষের সত্যকার সত্যের জন্য চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করে, যতদিনে না প্রাণ বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে, সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে যে খাঁটি আনন্দ হয়ত কোথাও থাকিলেও থাকিতে পারে, যতদিনে না শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়ে, চায় আপনা হইতে আপনার মুক্তি, আপনার সব সুখ-দুঃখ হইতে মুক্তি। তখনই এই ক্ষুদ্র অজ্ঞান ব্যক্তি-খণ্ডটির পক্ষে নিজের সত্যকার নিজত্বের মধ্যে এবং সেই সাথে পূর্ব্বে যে সকল রহস্তর বস্তুর কথা বলিয়াছি তাহাদের মধ্যে—অন্যথা আপনার লোপ সাধনের, নির্ব্বাণের মধ্যে —প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হয়।

সত্যকার যে আত্মা তাহা বহিস্তলে কোথাও নাই—তাহার স্থান অন্তরে ও ঊর্দ্ধে। অন্তরে আছে অন্তরাত্মা —সেখান হইতে এই অন্তরাত্মা ধারণ করিয়া আছে সেই আন্তর মন আন্তর প্রাণ আন্তর দেহ যাহাতে আছে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির সামর্থ্য আর আছে বর্ত্তমানে যাহা সব আমাদের কাম্য বস্তু তাহাদের অধিকারী হইবার সামর্থ্য—যথা, আত্মার সত্যের সাথে, বস্তুরাজির সত্যের সাথে সাক্ষাৎ সংযোগ, সার্ব্বভৌম আনন্দের আস্বাদন, স্থূল জড়দেহের কারাগারে যে ক্ষুদ্রতা, যত দৈন্য তাহা হইতে মুক্তি। এমন কি ইউরোপেও দেখি আজকাল প্রায়ই স্বীকার করা হইতেছে যে সৃষ্টির বহিস্তলটির পশ্চাতে একটা কিছুর অস্তিত্ব আছে—তবে সে দেশে

ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল করা হয়, ইহার নাম দেওয়া হয় অবচেতনা, মগ্নচেতনা; বস্তুতঃ জিনিষটি কিন্তু অত্যন্ত সচেতন, শুধু নিজস্ব ভঙ্গীতে আর তাহা মগ্ন নয়, কেবল আছে আবরণের অন্তরালে। আমাদের যোগতত্ত্ব অনুসারে বলিতে পারা যায়, সেই বস্তুটি বাহিরের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে কতকগুলি চেতনার কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া—এই কেন্দ্রগুলির জ্ঞান আসে যোগসাধনার ফলে। ইহাদেরই ভিতর দিয়া আন্তর সত্তার একটুখানি মাত্র কোনপ্রকারে বাহ্যজীবনের মধ্যে আসিয়া পড়ে—কিন্তু ঐ একটুখানিই হইল আমাদের মধ্যে যতটুকু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উহারই কল্যাণে দেখা দিয়াছে আমাদের শিল্প, কাব্য, দর্শন, যত আদর্শ, যত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানের জন্য পরিপূর্ণতার জন্য যত প্রয়াস। কিন্তু আন্তর কেন্দ্রগুলি প্রায়ই থাকে রুদ্ধ, না হয় সুপ্ত—তাহাদিগকে উন্মুক্ত করা, জাগ্রত ও সক্রিয় করিয়া তোলা হইল যোগসাধনার এক লক্ষ্য। যেমন তাহারা খুলিতে থাকে, অন্তরসত্তার শক্তি ও সম্ভাবনা সবও আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে। প্রথমে একটা বৃহত্তর চেতনার জ্ঞান এবং পরে একটা বিশ্বগত চেতনার জ্ঞান আমাদের হয়, তখন আর আমরা সীমাবদ্ধ জীবন লইয়া ক্ষুদ্র পৃথক ব্যক্তি হিসাবে থাকি না, আমরা তখন বিশ্বলীলার এক একটি কেন্দ্র, বিশ্বশক্তিরাজির সহিত আমরা সাক্ষাৎ সংযুক্ত। তা ছাড়া, এই সকল শক্তির হাতে আমাদের বাহ্য ব্যক্তিসত্তা যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রীড়া পুত্তলিকা

মাত্র তেমন আর আমরা থাকি না, আমরা কতক পরিমাণে প্রকৃতির খেলার সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারি, ও তাহার অধীশ্বর হইতে পারি—অবশ্য কতদূর পারি তাহা নির্ভর করে আন্তরসত্তা আমাদের কতখানি গড়িয়া উঠিয়াছে, ঊর্দ্ধাভিমুখে উচ্চতর সব অধ্যাত্ম-ভূমির দিকে কতখানি আপনাকে খুলিয়া ধরিয়াছে তাহার উপর। সেই সাথে, হৃদযকেন্দ্র খোলার ফলে অন্তঃপুরুষও নির্মুক্ত হইয়া আমাদিগকে আমাদের অন্তরস্থ ভগবানের, আমাদের ঊর্দ্ধস্থ উচ্চতর সত্যের সম্বন্ধে সচেতন করিতে থাকে।

ঊর্দ্ধতম অধ্যাত্ম-পুরুষ আমাদের ব্যক্তিত্বের এবং শারীর সত্তার পিছনেও নাই—আছে উপরে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া। আন্তর কেন্দ্রসমূহের সর্ব্বোচ্চ কেন্দ্রটি হইল মস্তকে—গভীরতমটি যেমন হইল হৃদয। কিন্তু আত্মার দিকে সাক্ষাৎভাবে যে কেন্দ্রটি উন্মীলিত, সেটি মস্তকেরও উপরে, স্থূলশরীরের একেবারে বাহিরে—যাহাকে বলা হয় "সূক্ষ্মশরীর" তাহার মধ্যে। এই আত্মার আছে দুটি রূপ, দুটির মধ্যে যেটি উপলব্ধি করা হয, উপলব্ধির ফলও হয তদনুরূপ। একটী হইল নিষ্ক্রিয—বৃহৎশান্তির, মুক্তির, নীরবতার অবস্থা, কোন ক্রিয়া বা বিষয়ানুভব শান্ত আত্মায় কিছু বিকার ঘটায না —সকলকে নিরপেক্ষভাবে সে ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদের জনযিতা বলিয়া তাহাকে মনে হয না, বরং সে যেন থাকে পিছনে সরিয়া, অনাসক্ত উদাসীন। আর

একটি ধারা হইল সক্রিয়—তাহাকেই বিশ্ব-আত্মা বা বিশ্বপুরুষরূপে উপলব্ধি করা হয়, সমগ্র জাগতিক ক্রিয়ার সে শুধু কেবল আশ্রয় তাহা নয়, তাহাদের সৃষ্টি করিতেছে, নিজের মধ্যে বহন করিতেছে—আর সে ক্রিয়াবলী কেবল আমাদের স্থূল আমিত্ব-সংক্রান্ত অংশটুকু নয়, ইহাকে ছাড়াইয়া যাহা কিছু—এই জগৎ ও আর আর যত জগৎ, বিশ্বের সূক্ষ্ম ও স্থূলাতীত সকল রাজ্য—ব্যাপিয়া সে রহিয়াছে। আরও আমরা অনুভব করি আত্মা সকলের মধ্যে এক, আবার সকলের উপরে, বিশ্বাতীত, যাবতীয় ব্যক্তিগত জীবন কি বিশ্বগত সত্তা অতিক্রম করিয়া আছে—এই ভাবেও আত্মাকে অনুভব করি। বিশ্ব-আত্মার মধ্যে, সকলের অন্তরে যে এক সত্তা তাহার মধ্যে প্রবেশ করার ফল অহং হইতে মুক্তি—অহং তখন চেতনার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র, বিশেষ অবস্থার উপযুক্ত বিশেষ যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত হয় অথবা চেতনা হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাই অহংএর নির্ব্বাণ। সব-কিছু অতিক্রম করিয়া উপরে যে বিশ্বাতীত পুরুষ, তাহাতে প্রবেশ করিলে আমরা বিশ্বগত চেতনা ও ক্রিয়া পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারি—এই পথেই শেষে লাভ হইতে পারে জাগতিক সত্তা হইতে পূর্ণ মুক্তি—ইহাকেও বলা হয় লয়, মোক্ষ, নির্ব্বাণ।

তবে লক্ষ্য করা দরকার, উপরের দিকে আপনাকে খোলা অর্থ যে কেবল শান্তি, নীরবতা, নির্ব্বাণেরই দিকে চলা তাহা নয়। একটা বৃহৎ—পরিণামে অসীম—শান্তি,

নীরবতা, বিস্তৃতি আমাদের উপরে, যেন আমাদের মাথার উপরে আছে, সকল স্থূল ও স্থূলাতীত আকাশ ব্যাপিয়া তাহা প্রসারিত—শুধু এই জিনিসটি নয়, আরও অন্যান্য জিনিসের জ্ঞান সাধকের হইতে পারে—একটা বিপুল শক্তি, যাহার মধ্যে আছে সকল সামর্থ্য, একটা বিপুল জ্যোতি যাহার মধ্যে সকল জ্ঞান, একটা বিপুল আনন্দ যাহার মধ্যে সকল দিব্যসুখ ও তীব্র রভস। প্রথমে ইহারা সকলে দেখা দেয় যেন একটা একান্ত মূলবস্তু, অনির্দ্দেশ্য, অদ্বিতীয়, অবিকল্প, কেবলং—এইভাবে; যে-কোনটির মধ্যে নির্ব্বাণ সম্ভব। কিন্তু ক্রমে আমরা এই প্রকারও দেখিতে পারি যে এই শক্তির মধ্যে যাবতীয় শক্তিধারা, এই জ্যোতির মধ্যে যাবতীয় জ্যোতিধারা, এই আনন্দের মধ্যে যত কিছু পুলক ও দিব্যসুখ। এই সমস্তই আমাদের মধ্যে অবতরণ করিতে পারে। শুধু শান্তি নয়—এ সকলের যে কোনটি বা ইহারা সকলেই নামিয়া আসিতে পারে। তবে সর্ব্বাগ্রে একটা অব্যভিচারী অচঞ্চলতা ও শান্তিকে নামাইয়া আনা সব চেয়ে নিরাপদ—কারণ, তাহা হইলে অন্য-সকলের অবতরণও হয় নির্ব্বিঘ্ন। নতুবা এতখানি শক্তি, জ্যোতি, জ্ঞান বা আনন্দ ধারণ করা আমাদের বাহ্যপ্রকৃতির পক্ষে দুরূহ হইতে পারে। এই সবগুলি লইয়াই হইল, যাহাকে আমরা বলি, ঊর্দ্ধতর অধ্যাত্ম বা ভাগবত চেতনা। হৃদয়ের মধ্যে দিয়া অন্তঃপুরুষের দিকে চেতনার উন্মীলন প্রধানতঃ ভগবানের ব্যষ্টিরূপের সহিত, যে-রূপের সাহায্যে ভগবানকে আমরা পাই অন্তরের সম্বন্ধ

ধরিয়া, তাঁহার সহিত, আমাদের সংযোগ স্থাপন করে—এ বস্তুটি বিশেষভাবে প্রেম ও ভক্তির উৎস। এই ঊর্দ্ধমুখী উন্মীলন আমাদিগকে সমগ্র ভগবানের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত করিয়া ধরে, তাহা আমাদের মধ্যে ভাগবত চেতনা, অধ্যাত্ম সত্তার এক নব জন্ম বা একাধিক জন্ম গড়িয়া তুলিতে পারে।

শান্তি যখন প্রতিষ্ঠিত, তখন উপর হইতে এই ঊর্দ্ধতর বা ভাগবত শক্তি অবতরণ করিয়া আমাদের মধ্যে কাজ করিতে পারে। সাধারণতঃ সে-শক্তি প্রথমে নামে মস্তকের মধ্যে, সেখানে আন্তর মনের কেন্দ্রগুলি উন্মুক্ত করিয়া ধরে; তারপর নামে হৃৎকেন্দ্রে এবং চৈত্য পুরুষকে ও ভাবময় পুরুষকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত করে, তারপরে নাভিকেন্দ্রে ও অন্যান্য প্রাণময় কেন্দ্রে, তথায় নির্ম্মুক্ত করিয়া ধরে আন্তর প্রাণকে; তারপর মূলাধারে ও আরও নিম্নে, সেখানে নির্ম্মুক্ত করে আন্তর শরীর সত্তাকে। সে-শক্তি মুক্তি ও সিদ্ধির জন্য যুগপৎ কাজ করে, সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অঙ্গ একে একে গ্রহণ করে ও তাহাদের উপর কাজ করিয়া চলে—যাহা বর্জ্জনীয় তাহা বর্জ্জন করে, যাহার ঊর্দ্ধায়ন করা যায় তাহা ঊর্দ্ধায়িত করে, যাহা সৃজনীয় তাহা সৃষ্টি করে। স্বভাবের মধ্যে সে স্থাপন করে একটা অখণ্ডতা, সামঞ্জস্য, নবীন ছন্দ। তাহা আবার ঊর্দ্ধতর প্রবৃত্তির ক্রমোর্দ্ধ শক্তি ও পরিধিকে নামাইয়া আনিতে পারে. এমন কি অতিমানস শক্তি ও সত্তাকে পর্য্যন্ত নামাইয়া আনা

সম্ভব হইতে পারে—তাহাই যদি হয় সাধনার লক্ষ্য। এই সমস্তই প্রস্তুত হয়, সামর্থ্য পায়, উপচিত হয়, হৃৎকেন্দ্রগত চৈত্য-পুরুষের ক্রিয়ার ফলে। এই অন্তঃপুরুষ যতখানি নির্ম্মুক্ত, সম্মুখস্থ ও সক্রিয়, দিব্যশক্তির কাজও তত দ্রুত, নির্ব্বিঘ্ন ও সহজ হইয়া উঠে। হৃদয়ে প্রেম ভক্তি সমর্পণ যত বৃদ্ধি পায়, সাধনার ক্রমবিকাশও হয় তত ক্ষিপ্র ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কারণ তখন অবতরণ আর রূপান্তরের অর্থই হইল যুগপৎ আবার ভগবানের সহিত ক্রমবর্দ্ধমান সংস্পর্শ ও সম্মিলন।

আমাদের সাধনার ইহাই মূলতত্ত্ব। স্পষ্ট দেখা যাইবে যে এই সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গ হইল দুইটি—এক, হৃৎকেন্দ্রকে, আর দ্বিতীয়তঃ মানস-কেন্দ্রগুলিকে তাহাদের পশ্চাতে ও উপরে যে সব জিনিষ আছে সেই দিকে খুলিয়া ধরা। হৃদয় আপনাকে খুলিয়া ধরে অন্তঃপুরুষের দিকে, এবং মানসকেন্দ্রগুলি খোলে উর্দ্ধতর চেতনার দিকে—আর অন্তঃপুরুষ ও উর্দ্ধতর চেতনা এই উভয়ের গাঢ়বন্ধই হইল সিদ্ধির মুখ্য উপায়। প্রথম, হৃদয় খুলিবার জন্য চাই হৃদয়ে একাগ্রতা, ভগবানকে আহ্বান করা, যাহাতে তিনি আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হন এবং অন্তঃপুরুষের ভিতর দিয়া আমাদের সমস্ত প্রকৃতি অধিকার করেন, চালিত করেন। সাধনার এই ভাগটির প্রধান অবলম্বন হইল আস্পৃহা, প্রার্থনা, ভক্তি, অনুরাগ, সমর্পণ—সেই সঙ্গে আমাদের ইষ্টলাভের পথে যাহা কিছু অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় তাহার পরিবর্জ্জন। দ্বিতীয়তঃ,

মনটি খুলিতে হইলে চাই মস্তকে (পরে, মস্তকের উপরে) চেতনাকে একাগ্র করা এবং সত্তার মধ্যে ভাগবত শান্তি, শক্তি, জ্যোতি, জ্ঞান, আনন্দ যাহাতে অবতরণ করে তজ্জন্য একটা আস্পৃহা, আবাহন এবং অবিচ্ছিন্ন দৃঢ়-সঙ্কল্প। প্রথমেই চাই বিশুদ্ধ শান্তি, কিংবা শান্তি ও শক্তি যুগপৎ। কেহ কেহ অবশ্য প্রথমে পায় জ্যোতি অথবা আনন্দ কিংবা জ্ঞানের একটা আকস্মিক অভিবর্ষণ। আবার আর কাহারও কাহারও চেতনা এমনভাবে খুলিয়া যায় যে সেই পথে তাহাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয় উর্দ্ধে এক বৃহৎ অসীম নীরবতা, শক্তি, জ্যোতি অথবা আনন্দ— পরে তাহারা এই সকলের মধ্যে আরোহণ করিতে পারে কিম্বা এই সকলই তাহাদের নিম্নতর প্রকৃতির মধ্যে অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। আবার অন্য কাহারও পক্ষে অবতরণ হয় প্রথমে মস্তকের মধ্যে। তারপর হৃদয়স্তর অবধি, তারপর নাভি পর্য্যন্ত এবং আরও নিম্নে, শেষে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া। অথবা কেমন এক অবোধ্য উপায়ে—অবতরণের অনুভব না হওয়া সত্ত্বেও শান্তির, জ্যোতির, বিস্তৃতির, শক্তির মুখ খুলিয়া যায়, কিম্বা তির্য্যক্‌ভাবে, বিশ্বচেতনার মধ্যে প্রবেশলাভ হয় অথবা অকস্মাৎ প্রসারিত মনের মধ্যে হয় জ্ঞানের পরিস্ফুরণ। যাহাই আসুক না কেন সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। সকলের পক্ষে প্রযোজ্য অব্যভিচারী নিয়ম কিছু নাই। কিন্তু শান্তি যদি প্রথমে না আসিয়া থাকে, তবে সাবধান হইতে হইবে পাছে উল্লাসে

আপনাকে অতিস্ফীত না করিয়া তুলি, কিম্বা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ি। সে যাহা হউক, তবে সাধনা তখনই পায় তার পূর্ণ গতি যখন ভাগবতী শক্তি—মাতৃশক্তি—অবতীর্ণ হন এবং সব অধিকার করেন—কারণ তখনই চেতনার নবসংগঠন আরম্ভ হয়, সাধনা লাভ করে তার বৃহত্তর প্রতিষ্ঠা।

সাধারণতঃ একাগ্রতার ফল তৎক্ষণাৎই হয় না—কাহারও কাহারও মধ্যে একটা দ্রুত ও আকস্মিক স্ফুরণ দেখা যায় বটে, তবে অধিকাংশেরই পক্ষে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া, আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত করিয়া চলিবার জন্য ন্যূনাধিক সময় প্রয়োজন হয়—বিশেষতঃ স্বভাবটি যদি পূর্ব্ব হইতে আস্পৃহা ও তপস্যা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে তৈয়ার না হইয়া থাকে। একাগ্রতা সাধনার সাথে পুরাতন যোগপন্থার কোন একটি প্রক্রিয়াও অভ্যাস করিলে ফললাভের পথ কখন কখন সুগম হয়। এক আছে অদ্বৈত জ্ঞান-যোগের প্রক্রিয়া—দেহ প্রাণ মনের সাথে যে একাত্মবোধ তাহা দূর করিতে হয়, নিরন্তর বলিতে হয় "আমি মন নই", "আমি প্রাণ নই", "আমি দেহ নই", এ সকল নিজের সত্য-সত্তা হইতে পৃথক এই ভাবে দেখিতে হয়, কিছুকাল পরে অনুভব হয় মনের প্রাণের দেহের সব বৃত্তি, এমন কি দেহ প্রাণ মন বলিয়া যে বোধ তাহা পর্য্যন্ত বাহিরের বস্তু, বাহ্যক্রিয়ামাত্র, হইয়া পড়িয়াছে; সাথে সাথে ভিতরে এই সকল হইতে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক আত্মপ্রতিষ্ঠ সত্তার বোধ উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি পায় আর এই বোধ ক্রমে আপনাকে বিশ্বভূত ও বিশ্বাতীত আত্মার উপলব্ধির মধ্যে উন্মুক্ত করিয়া ধরে। তারপর আছে সাংখ্যের পুরুষপ্রকৃতি বিভেদ—প্রক্রিয়াটি বিশেষ ফলদায়ী। মনকে জোর করিয়া সাক্ষীভাব গ্রহণ করাইতে হয়—তাহাতে দেখা যায় মনের প্রাণের দেহের সকল ক্রিয়া বাহ্য খেলা মাত্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা আমি বা আমার নয়, তাহা হইতেছে প্রকৃতির—আমার একটা বাহ্য আমির উপর আরোপিত হইয়াছে, আমি সাক্ষী পুরুষ—শান্ত উদাসীন, এ সবলে কোথাও আবদ্ধ নই। ফলে সাধকের সত্তায় দুটি ভাগ ক্রমে দেখা যায়—সাধক অনুভব করে তাহার ভিতরে একটা শান্ত স্তব্ধ পৃথক চেতনা গড়িয়া উঠিতেছে, সে বস্তুটি আপনাকে মনোময়, প্রাণময় অন্নময় প্রকৃতির স্থূল লীলা হইতে একান্ত বিভিন্ন বলিয়া বোধ করে। সাধারণতঃ এই রকম অবস্থায় উদ্ধতর চেতনার শান্তিকে, ঊর্দ্ধতর শক্তির ক্রিয়াকে এবং যোগের পূর্ণ গতিকে সত্বর নামাইয়া আনা সম্ভব হয়। কখন কখন ঐকান্তিক একাগ্রতার ও আহ্বানের প্রত্যুত্তরে মহাশক্তি স্বয়ং প্রারম্ভেই অবতীর্ণ হন, তখন প্রয়োজন হইলে তিনি এই সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন অথবা অন্য কোন উপায় বা প্রক্রিয়া যাহা সহায়ক বা অপরিহার্য্য তাহা ব্যবহার করেন।

আর একটি কথা, উপর হইতে যখন এই অবতরণ হইতে থাকে এবং তদনুসারে কাজ চলিতে থাকে তখন

সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর না করিয়া গুরুর নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করা এবং যাহা কিছু ঘটে সে-সব বিচার, ব্যবস্থা ও মীমাংসার জন্য তাঁহার কাছে উপস্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন, অনেক সময়ে দেখা যায় নিম্ন-প্রকৃতির শক্তি সব ঊর্দ্ধের অবতরণের ফলে উত্তেজিত ও উদ্দীপিত হইয়া উঠে—ইহার সহিত মিশিয়া, ইহাকে নিজের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিতে চায়। এমনও কখন কখন ঘটে যে কোন অদিব্য প্রকৃতির এক শক্তি বা একাধিক শক্তি সে ভগবান কি ভগবতী এই বলিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় আর সাধকের সেবা ও নতি দাবি করে। যদি ইহাদের স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে তাহার ফল হয় নিরতিশয় বিপত্তিকর। অবশ্য যদি কেবল ভাগবত শক্তিরই ক্রিয়ার জন্য সাধকের সম্মতি থাকে আর ভাগবত নির্দ্দেশেরই কাছে তাহার নতি ও সমর্পণ থাকে, তবে সবই নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে। এই সম্মতি আর যত অহংময় শক্তি কিম্বা যে-সব শক্তি অহংকারের সমর্থন পায় তাহাদের প্রত্যাখ্যান—ইহাই হইল সাধনার সমস্তখানি পথে রক্ষাকবচ। কিন্তু প্রকৃতির কর্ম্মধারায় সর্ব্বত্র ফাঁদ পাতা রহিয়াছে, অহংএর ছদ্মবেশ অগণিত, অজ্ঞানময় শক্তিদের—রাক্ষসী-মায়ার—মায়াসৃষ্টি অতীব নিপুণ। বিচার নির্ভরযোগ্য দিশারী নয়, অনেক সময়ে তাহা বিশ্বাসঘাতকই হইয়া পড়ে, প্রাণজ বাসনাও সঙ্গে সর্ব্বদাই চলিয়াছে, যে-কোন প্রেরের আহ্বান অনুসরণ করিতে আমাদের প্রলুব্ধ করিতেছে। ঠিক

এই কারণেই আমাদের যোগে, যাহাকে বলি "সমর্পণ", তাহার উপর আমরা এতখানি জোর দিয়া থাকি। হৃৎকেন্দ্র যদি সম্পূর্ণ খুলিয়া থাকে, অন্তঃপুরুষের শাসন যদি সর্ব্বদাই বহিয়া থাকে তবে কোন প্রশ্ন নাই—সব নিরাপদ। কিন্তু যে কোন সময়ে নিম্নের এক চেতনা-তরঙ্গ হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া চৈত্য-পুরুষকে আবৃত করিয়া ফেলিতে পারে। এ সকল বিপদ হইতে মুক্ত যাহারা তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প—তাহাদেরই পক্ষে সমর্পণ সহজ-সাধ্য। ভগবানের প্রতিভূ যিনি অথবা ভগবানের সহিত একাত্ম যিনি তাঁহার নির্দ্দেশ এই কঠিন প্রয়াসে অবশ্য-প্রয়োজন ও অপরিহার্য্য।

আমি যাহা লিখিলাম আশা করি তাহার সাহায্যে আমাদের যোগের মূল প্রক্রিয়াটি বলিতে আমি কি বুঝি সে সম্বন্ধে তোমার কিছু স্পষ্ট ধারণা হইবে, একটু সবিস্তারেই লিখিয়াছি, তবে বলা বাহুল্য মূল কথাগুলি ছাড়া আর কিছু আলোচনা-ভুক্ত করিতে পারি নাই। যে সব জিনিষ অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে, যাহা খুঁটিনাটি সংক্রান্ত তাহাদের কথা উঠিতে থাকিবে পদ্ধতিটিকে যখন কার্য্যে ক্রমস্ফূর্ত্ত করিয়া চল—অর্থাৎ পদ্ধতিটি যখন আপনাকে ক্রমস্ফূর্ত্ত করিয়া চলে—কারণ, সাধনার ক্রিয়া ফলপ্রদ হইতে আরম্ভ করিলে এই শেষোক্ত জিনিষটাই আসলে ঘটে।

*

* *

এখন একাগ্রতার কথা। সাধারণতঃ চেতনা থাকে সর্ব্বত্র বিস্তৃত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—এইদিকে কি ঐদিকে, এই বিষয়ের পশ্চাতে কি ঐ বস্তুর পশ্চাতে বহুলভাবে সে ছুটিয়া চলিয়াছে। এমন কাজ যদি করিতে হয় যাহাতে অবিচ্ছিন্ন যত্ন প্রয়োজন, তবে প্রথমেই এই বিক্ষিপ্ত চেতনাকে ফিরাইয়া আনিয়া একাগ্র করা আবশ্যক. একটু অভিনিবেশের সাথে দেখিলে দেখা যায় যে এই একাগ্রতা বিশেষ একটি স্থানে এবং একটি বিশেষ কার্য্যের, বিষয়ের বা বস্তুর উপর হইতে বাধ্য—এই যেমন, যখন তুমি একটি কবিতা রচনা করিতে থাক কিম্বা উদ্ভিদ-বৈজ্ঞানিক একটি ফুল পর্য্যবেক্ষণ করেন। স্থানটি সাধারণত মস্তিষ্কের মধ্যে কোথাও, যদি একাগ্রতার বিষয় হয় চিন্তা—কিম্বা হৃদয়ের মধ্যে, যদি একাগ্রতার বিষয় হয় অনুভব। যোগের একাগ্রতাও ঐ একই জিনিষ, তবে তাহা ব্যাপকতর ও গাঢ়তর। একটি বস্তুরও উপরে চেতনাকে একাগ্র করা যাইতে পারে—যেমন কোন উজ্জ্বল বিন্দুর উপর ত্রাটক করা তখন এমনভাবে একাগ্র হইতে হয় যে কেবল ঐ বিন্দুটিই দেখা যায়, ঐটি ছাড়া আর কোন ভাবনাও কিছু থাকে না। একাগ্রতার বিষয় আবার একটি চিন্তা, শব্দ বা নামও হইতে পারে—যথা, ভগবানের চিন্তা, ওঁ শব্দ, কৃষ্ণ নাম কিংবা চিন্তার সঙ্গেই থাকিতে পারে শব্দ কি নাম। কিন্তু তা ছাড়া, যোগ-সাধনাতেও একটি বিশেষ স্থানে চেতনাকে একাগ্র করা যায়,—যেমন, ভ্রূ মধ্যে। একাগ্রতা সাধনার

এই উপায়টি সর্ব্বজনবিদিত—ভ্রূ মধ্যে হইল আন্তর মনের, সূক্ষ্ম দৃষ্টির, মানস-সঙ্কল্পের কেন্দ্র। প্রক্রিয়াটি এই—যে বিষয়টির উপর একাগ্র হইতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে ঐস্থান হইতে দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিতে হয়, অথবা ঐস্থান হইতে তাহার একটি মূর্ত্তি দেখিতে চেষ্টা করিতে হয়, যদি সফল হও, তবে ক্রমে তোমার বোধ হয় যেন তোমায় সমস্ত চেতনা ঐ স্থানটিতে কেন্দ্রীভূত—অবশ্য ঐ সময়টুকুর জন্য, কিছুকাল অভ্যাস করার পর, জিনিষটি সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

আশা করি কথাটি স্পষ্ট হইল এই পর্য্যন্ত। এখন, আমাদের যোগে ঐ একই কাজ করিতে হয়, তবে কোন এক বিশেষ কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া নয়, কিন্তু মস্তকের মধ্যে কোথাও কিংবা শারীর-বৈজ্ঞানিকেরা যেখানে "হার্দ্দিক কেন্দ্র" (Cardiac Centre) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বুকের মধ্যে সেই স্থানটিতে, আর কোন একটি বস্তুর উপর একাগ্র না হইয়া, একাগ্র হইতে হয় মস্তিষ্কের মধ্যে একটি সঙ্কল্প ধরিয়া, উপর হইতে শান্তি অবতরণ করুক এই আবাহন ধরিয়া অথবা অনেকে যেমন করে, যাহাতে অদৃশ্য আবরণটি খুলিয়া যায় এবং চেতনা ঊর্দ্ধে উঠিয়া চলে এই জন্য। হৃদয়ে একাগ্র হইতে হয় একটি আস্পৃহার মধ্যে, যাহাতে আপনাকে খুলিয়া ধরিতে পারে সেইজন্য, সেখানে যাহাতে ভগবানের জাগ্রত বিগ্রহ অথবা অন্য যাহা কিছু উদ্দেশ্য হয় তাহার জন্য। নাম জপও করা যাইতে পারে—তাহা হইলে তবে নামের উপর

একাগ্র হইতে হইবে এবং নামটি যাহাতে হৃদয়ের মধ্যে স্বতঃ-উচ্চারিত হয় তাহা দেখিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই রকম বিশেষ কোন স্থানে যখন একাগ্র হওয়া যায় তখন চেতনার অবশিষ্ট অংশের কি হয়। অবশিষ্ট অংশটি নীরব হইয়া যায়—সকল একাগ্রতার ফলই এই, অথবা যদি তাহা না হয় তবে চিন্তা বা আর-আর বস্তু সব এদিক ওদিক—যেন বাহিরে বাহিরে—বিচরণ করে, কিন্তু একাগ্র অংশটি সেদিকে নজর দেয় না, লক্ষ্যও করে না। একাগ্রতা যখন মোটামুটি সফল তখন এই রকম ঘটে।

প্রথম প্রথম, অভ্যাস না থাকিলে বেশিক্ষণ একাগ্র হইয়া থাকিতে নাই, তাহাতে শ্রান্তি আসে—ফলে, ক্লান্তিজর্জর মনে একাগ্রতার শক্তি ও উপকারিতা কিছু থাকে না, তখন একাগ্রতার পরিবর্তে চেতনাকে একটু বিরাম দিয়া সহজধ্যান (নিদিধ্যাসন) করা যাইতে পারে। একাগ্রতা যখন স্বাভাবিক অবস্থার জিনিষ হইয়া উঠে, তখনই সময়ের মাত্রা ক্রমে বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কর্ম্ম

অনুভূতিলাভের জন্য সম্পূর্ণভাবে ভিতরে চলিয়া যাওয়া এবং কর্ম্মকে ও বাহিরের চেতনাকে অবহেলা করার অর্থ সাধনার সামঞ্জস্য হারান ও একদিকেই ঝুঁকিয়া পড়া, কেননা, আমাদের যোগ পূর্ণাঙ্গ। সেইরূপ নিজেকে বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা এবং একান্তভাবে বহিঃসত্তার মধ্যে বাস করারও অর্থ সাধনায় সামঞ্জস্য হারান ও একদিকেই ঝুঁকিয়া পড়া। আন্তর অনুভূতি ও বাহিরের কর্ম্মের মধ্যে একই চেতনা থাকা চাই, উভয়কেই মায়ের সত্তায় পূর্ণ করিয়া তোলা প্রয়োজন।

*
* *

আন্তর অনুভূতি ও বহির্বিকাশ এই দুইয়ের মধ্যে সাম্যরক্ষা করিয়া চলিতে কর্ম্ম সহায়তা করে। নতুবা একদেশীভাব, মাত্রা ও সামঞ্জস্যের অভাব আসিয়া পড়িতে পারে। অধিকন্তু, সাধনা হিসাবে ভগবদর্থে কর্ম্ম করারও প্রয়োজন আছে। কেননা, পরিশেষে উহা সাধককে বাহিরের প্রকৃতি ও জীবনের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিকাশকে প্রকট করিতে সক্ষম করে এবং সাধনার পূর্ণাঙ্গতায় সহায়তা করে।

*
* *

সব নির্ভর করে ভিতরের অবস্থার উপর—বাহিরের অবস্থা ভিতরের অবস্থাটি প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠিত করিবার, তাহাকে কর্ম্মতৎপর এবং সফল করিয়া তুলিবার পক্ষে সহায় ও উপায় মাত্র। যদি চৈত্যপুরুষের চেতনাকে সর্ব্বাগ্রে রাখিয়া অথবা যথাযথ আন্তর প্রেরণা হইতে কিছু কাজ কর অথবা কথা বল তাহা হইলে উহা ফলদায়ক হইবে, ঐ একই জিনিষ যদি মন বা প্রাণ হইতে অথবা ভ্রান্ত কি মিশ্রিত ভাব লইয়া কর বা বল তবে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে সত্য কর্ম্মটি সত্যভাবে করিতে হইলে তোমাকে সত্য চেতনায় বাস করিতে হইবে—কোনও একটা বাধাধরা মানসিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া তাহা করা যায় না, কেননা, কোনও কোনও অবস্থায় উহা উপযোগী হইতে পারে, আবার কোথাও বা আদৌ নাও হইতে পারে। সাধারণ একটা বিধি দেওয়া যাইতে পারে বটে, যদি সত্যের সহিত উহার মিল থাকে, কিন্তু ভিতরের চেতনার দ্বারা তাহার প্রয়োগ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে, সেই চেতনাই দেখিবে প্রতি পদক্ষেপে কি করিতে হইবে বা না হইবে। চৈত্যপুরুষ যদি সর্ব্বাগ্রে থাকে, সত্তা যদি সর্ব্বতোভাবে মায়ের দিকে ফিরিয়া থাকে এবং চৈত্যপুরুষকেই অনুসরণ করিয়া চলে তাহা হইলে ইহা ক্রমে অধিকতর মাত্রায় করা যাইতে পারে।

*

* *

একটা মোটের উপর সাধনভাব লইয়া চলিলেই হইবে না—প্রত্যেক কাজটি মায়ের কাছে অর্পণ করিতে হইবে যাহাতে সর্ব্বদা ঐ সাধনভাবটি জীবন্ত থাকিতে পারে। কাজের সময় ধ্যান সমীচীন নয়, কারণ উহা কাজটি হইতে মনকে সরাইয়া লয়, কিন্তু কাজটি অর্পণ করা হইতেছে যাহাকে সেই ভগবানের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি থাকা প্রয়োজন। তবে এইটি হইল কেবল প্রথম প্রক্রিয়া, কারণ বাহ্য মন যখন কাজ করিতেছে তখন যদি ভিতরে ভাগবত-অনুভূতিতে স্থির-নিবিষ্ট এক শান্ত-সত্তার অবিচ্ছেদ উপলব্ধি তোমার থাকে অথবা যদি তুমি সর্ব্বদা অনুভব করিতে আরম্ভ কর যে মায়ের শক্তিই কাজটি করিয়া চলিয়াছে, তুমি আধার বা যন্ত্র মাত্র, তাহা হইলে স্মরণের পরিবর্ত্তে কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভগবানের সহিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিত্যযোগানুভূতি আরম্ভ হইবে।

* * *

একমাত্র সেই কর্ম্মই অধ্যাত্ম পরিশুদ্ধি আনয়ন করিতে পারে যাহা কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লইয়া করা হয় না—যাহা যশ, লোকপ্রশংসা বা সাংসারিক মহত্ত্বের বাসনা লইয়া করা হয় না, যাহা আপন মানসিক কোন অভিপ্রায় বা প্রাণের কামনা ও দাবি অথবা দৈহিক অভিরুচির উপর জোর দিয়া করা হয় না, যাহা মিথ্যা-গর্ব্ব বা রূঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা পদ ও মর্যাদার দাবি লইয়া করা হয় না, পরন্তু একমাত্র ভগবানের জন্য এবং

ভগবানেরই আদেশে করা হয়। অহঙ্কৃত ভাব লইয়া যে সমস্ত কাজ করা হয় অজ্ঞানময় জগতের লোকের পক্ষে যতই কল্যাণকর হউক না কেন যোগসাধকের কোন উপকারেই তাহা আসে না।

*
* *

সাধারণ জীবন সেইরূপ কর্ম্ম লইয়া যাহা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং বাসনাচরিতার্থতার জন্য কোনপ্রকার মানসিক বা নৈতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে সম্পাদন করা হয়—সে নিয়ন্ত্রণের উপর কখন কখন মানসিক আদর্শপরতারও প্রভাব থাকে। গীতোক্ত যোগ হইতেছে সমস্ত কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্বরূপ উৎসর্গ করা, বাসনার জয়, অহংশূন্য ও বাসনাশূন্য কর্ম্ম, ভগবানের প্রতি ভক্তি, বিশ্বচেতনায় অনুপ্রবেশ, সর্ব্বজীবের সঙ্গে ঐক্যবোধ, ভগবানের সঙ্গে একত্ব লাভ। ইহার সহিত এই যোগ আরও চায় অতিমানস জ্যোতি ও শক্তিকে নামাইয়া আনিতে (ইহাই চরম লক্ষ্য) এবং প্রকৃতির রূপান্তর সাধন করিতে।

*
* *

কোন্ বিশেষ কাজটি তুমি করিতেছ তাহার উপর তোমার আত্মোৎসর্গ নির্ভর করে না, নির্ভর করে কি ভাব লইয়া তোমার সকল কর্ম্ম করিতেছ তাহার উপর—যে ধরণেরই কর্ম্ম তাহা হউক না কেন। সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত ও যত্নের সহিত কৃত যে কোন কাজ ভগবানের

উদ্দেশে যজ্ঞরূপে করা হয়, বাসনাশূন্য ও অহংশূন্য হইয়া, সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যে সমতাযুক্ত মনে ও শান্ত স্থিরভাব লইয়া ভগবদর্থে করা হয়, যাহা ব্যক্তিগত কোন লাভ, পুরস্কার বা ফলের জন্য করা হয় না, ভাগবতী শক্তিই সব কর্ম্মের অধিশ্বরী এই বোধ হইতে যে কাজ করা হয়, তাহা কর্ম্মের মধ্য দিয়া আত্মোৎসর্গের একটা উপায়।

*
* *

অতি স্থূলতম দৈহিক এবং যন্ত্রবৎচালিত কর্ম্মও যথাযথভাবে করা যায় না যদি অসামর্থ্য, জড়তা ও নিশ্চেষ্টতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহার প্রতিকার কেবল যন্ত্রবৎচালিত কর্ম্ম লইয়া থাকা নয় পরন্ত অসামর্থ্য, নিশ্চেষ্টতা ও জড়তা বর্জ্জন করা, দূরীভূত করা এবং নিজেকে মায়ের শক্তির দিকে খুলিয়া ধরা। মিথ্যা-গর্ব্ব, দুরাকাঙ্ক্ষা ও আত্মাভিমান যদি বাধা হইয়া দাঁড়ায় তবে ঐসব তোমার মধ্য হইতে বিদূরিত করিবে। উহারা আপনা হইতে চলিয়া যাইবে শুধু এই অপেক্ষায় থাকিলে তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইবে না। কোন জিনিষ আপনা হইতে ঘটিবে শুধু এই অপেক্ষায় থাকিলে তাহা আদৌ কেন যে ঘটিবে তাহার কোন কারণ নাই। অসামর্থ্য দৌর্ব্বল্য যদি প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, তবু সাধক যখন যথার্থতঃ এবং ক্রমশঃ অধিকতর মায়ের শক্তির কাছে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া ধরে তখন করণীয়

কাজটির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য তাহাকে দেওয়া হয় এবং আধারের মধ্যে তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

*
* *

যাহারা পূর্ণ ঐকান্তিকতা লইয়া মায়ের জন্য কাজ করে তাহারা ধ্যান করিতে না বসিলেও বা যোগের কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ না করিলেও ঐ কাজের দ্বারাই যথাযথ-চেতনালাভের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। ধ্যান কিরূপে করিতে হয় তাহা তোমাকে বলিয়া দিবার দরকার নাই। প্রয়োজনীয় জিনিষটি আপনা হইতেই আসিবে যদি তোমার কর্ম্মে এবং সর্ব্বদা তুমি ঐকান্তিক হও ও মায়ের দিকে নিজেকে উন্মুক্ত করিয়া রাখ।

*
* *

কাজের মধ্যে নিজেকে উন্মুক্ত রাখা আর চেতনার মধ্যে নিজেকে উন্মুক্ত রাখা একই কথা। যে শক্তি ধ্যানের সময় তোমার চেতনায় কাজ করে এবং তুমি তাহার দিকে উন্মুক্ত হইলেই অন্ধকার ও মোহ দূর করিয়া দেয়, সেই একই শক্তি তোমার কর্ম্মের ভারও গ্রহণ করিতে পারে এবং তোমার কাজের ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে তোমাকে শুধু সচেতন করা নয়, কি কাজ করিতে হইবে সে বিষয়েও তোমাকে সচেতন করিতে পারে, তাহার সম্পাদনে তোমার মন ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে পরিচালিতও করিতে পারে। কাজের সময় যদি তুমি এই শক্তির

কাছে নিজেকে উন্মুক্ত কর তবে তুমি এই দিব্য পরিচালনা ক্রমে অধিকতর অনুভব করিতে থাকিবে, পরিশেষে তোমার সমস্ত কর্মের পিছনে মায়ের শক্তি অনুভব করিবে।

*
* *

সাধনার এমন কোন অবস্থা নাই যেখানে কাজ অসম্ভব—যোগপথে এমন কোন স্তর নাই যেখানে দাঁড়াইবার কোন অবলম্বন পাওয়া যায় না এবং ভগবানের উপর ঐকান্তিক মনঃসংযোগের বিরোধী বলিয়া কর্ম ত্যাগ করিতে হয়। অবলম্বন সর্ব্বদাই আছে—তাহা হইল ভগবানে নির্ভর, ভগবানের দিকে সত্তা, ইচ্ছা ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সব খুলিয়া ধরা, ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ। এই ভাব লইয়া যে কাজ করা যায় তাহাকে সাধনার সহায় করিয়া তোলা যাইতে পারে। কোথাও কোথাও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সাময়িকভাবে ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাওয়া ও তখন কাজ বন্ধ রাখা বা তাহাকে গৌণ করিয়া রাখা প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু উহা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থা ও সাময়িক অবসর-গ্রহণ হইতে পারে। তদ্‌ব্যতীত কর্ম্ম হইতে পূর্ণ বিরতি ও সম্পূর্ণভাবে আপনার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া কদাচিৎ সমীচীন। ইহা অতিমাত্রায় একদেশী এবং স্বপ্নালু অবস্থার প্রশ্রয় দিতে পারে—যেখানে সাধক বাহিরের বাস্তব সত্য অথবা সর্ব্বোচ্চ সত্য কোনটিকে দৃঢভাবে না ধরিয়া

কেবল আভ্যন্তরীণ অনুভূতির এক প্রকার মধ্যজগতে বাস করে—আর এই আভ্যন্তরীণ অনুভূতির যথাযথ ব্যবহার করিয়া সর্ব্বোচ্চ সত্য ও জীবনে বাহ্য সিদ্ধির মধ্যে প্রথমে দৃঢ় সংযোগসূত্র ও পরে একান্ত ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারে না।

কাজ দুই প্রকারের হইতে পারে—যে কর্ম্ম সাধনার জন্য, সত্তা ও তাহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর সামঞ্জস্যসাধন ও তাহাদের রূপান্তরের জন্য অভিজ্ঞতার ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত এবং যে কর্ম্ম ভগবৎ-প্রকাশের সিদ্ধরূপ। কিন্তু এই শেষোক্তটির সময় তখনই আসে যখন সিদ্ধিকে পূর্ণরূপে পার্থিব চেতনায় নামাইয়া আনা হইয়াছে। যতক্ষণ না তাহা হইতেছে ততক্ষণ সমুদয় কর্ম্মই সাধনার ক্ষেত্র এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের শিক্ষায়তন হইতে বাধ্য।

*
* *

ভক্তি আমি কখন নিষিদ্ধ করি নাই, আর ধ্যানকেও কখন যে নিষিদ্ধ করিয়াছি তাহা আমি জ্ঞাত নহি। আমার যোগে কর্ম্মের উপর যেমন তেমনি ভক্তি এবং জ্ঞানের উপরও জোর দিয়াছি—যদিও শঙ্কর বা চৈতন্যের মত উহাদের কোনটিকে আমি একান্ত প্রাধান্য দিই নাই।

সাধনায় তুমি যে দুরূহতা অনুভব করিয়া থাক বা অন্য কোন সাধক অনুভব করিয়া থাকে তাহা প্রকৃতপক্ষে ধ্যান বনাম ভক্তি বনাম কর্ম্মের প্রশ্ন নয়, সাধনায় কোন্ মূলভাব গ্রহণ করিতে হয়, কোন দিক দিয়া অগ্রসর হইতে

হইবে—কথাটি যে-ভাবেই বল না কেন—সেই বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যের দুরূহতা।

এখনো যদি কাজের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ ভগবানকে স্মরণে রাখিতে না পার তবে তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আরম্ভের সময়ে স্মরণ করা ও উৎসর্গ করা এবং কাজ সমাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, বড় জোর কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্মরণ করা বর্ত্তমানের পক্ষে যথেষ্ট। তোমার পদ্ধতি কষ্টকর ও দুরূহ বলিয়াই আমার মনে হয়। তুমি মনের একই অংশের দ্বারা স্মরণ করিতে ও কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছ বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু ইহা যে সম্ভব তাহা আমি জানি না। সাধক যখন কর্ম্মের সময়েও সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলে (ইহা করা যাইতে পারে) তখন মনের একটা ভিতরের অংশের দ্বারাই সাধারণতঃ ঐরূপ করিয়া থাকে অথবা ক্রমে দ্বিমুখ চিন্তা বা চেতনার একটি বৃত্তি গড়িয়া উঠে—একটি সম্মুখে থাকিয়া কাজ করে, অপরটি ভিতরে থাকিয়া দর্শন করে ও স্মরণ করে। আরো একটি পন্থা আছে, তাহা অনেক দিন আমার নিজের ছিল। সে অবস্থায় কাজ স্বতঃই হইয়া যায়, তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত চিন্তা বা মনের ক্রিয়া আসিয়া পড়ে না, চেতনা ভগবানের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া থাকে। এই জিনিষটি ঠিক চেষ্টা করিয়া পাওয়া যায় না, ইহা আসিয়া থাকে খুব সরল অবিরাম এক আস্পৃহা ও উৎসর্গের সঙ্কল্প দ্বারা অথবা চেতনার এমন একটি ক্রিয়ার ফলে যাহা যন্ত্রভূত সত্তা হইতে আন্তর সত্তাকে পৃথক্ করিয়া

ধরে। আস্পৃহা ও উৎসর্গ-সঙ্কল্পের দ্বারা বৃহত্তর শক্তিকে কর্ম্মসম্পন্নের জন্য নামাইয়া আনা যায়, এই প্রণালীটি বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ—যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়। সাধনার মহান্ রহস্য এক এই—মনের চেষ্টার দ্বারা সব কিছু করিবার পরিবর্ত্তে পিছনের বা ঊর্দ্ধের শক্তির দ্বারা কিরূপে কার্য্য করাইয়া লওয়া যায় তাহা জানা। আমি বলিতে চাই না মানস চেষ্টা অপ্রয়োজন বা নিষ্ফল, কিন্তু মন যদি শুধু নিজের শক্তিতে সব করিবার চেষ্টা করে তবে একমাত্র অধ্যাত্ম মল্লগণ ব্যতীত অন্য সকলের পক্ষে উহা কষ্টসাধ্য প্রয়াস হইয়া দাঁড়ায়। আমি এমনও বলি না যে অপর পন্থাটিই বাঞ্ছনীয় হ্রস্বতম পথ—সেই পথ দিয়াও ফল পাইতে দীর্ঘ সময় লাগিতে পারে। সকল প্রকার সাধন পন্থাতেই ধৈর্য্য এবং দৃঢ় সঙ্কল্প প্রয়োজন।

শক্তিমানে শক্তি যোগ্য স্থানে যোগ্য বস্তু—তবে আস্পৃহা ও তাহাতে সাড়া দেয় যে ভগবৎকৃপা, এ সবও একেবারে অলীক নহে—অধ্যাত্মজীবনে ইহারা মহান্ সত্য।

*
* *

কর্ম্ম বলিতে আমি যে কর্ম্ম অহংভাবে ও অজ্ঞানে, অহং-এর তৃপ্তির জন্য এবং রাজসিক বাসনার প্রেরণায় করা হয়, তাহা বুঝি না। অহংকার, রজোগুণ ও বাসনা বর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প ব্যতীত কর্ম্মযোগ হইতেই পারে না—কারণ, ইহারা অজ্ঞানের স্বরূপ।

পরোপকার বা মানবজাতির সেবা অথবা নৈতিক বা আদর্শমূলক অন্য যে সব জিনিষকে মানুষের মন কর্ম্মের গভীরতর সত্যের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করে, আমি কর্ম্ম বলিতে তাহাও বুঝি না।

কর্ম্ম বলিতে আমি বুঝি সেই কর্ম্ম যাহা ভগবানের জন্য এবং উত্তরোত্তর ভগবানের সঙ্গে যোগ-যুক্ত হইয়া করা হয়—একমাত্র ভগবানেরই জন্য আর কিছুর জন্য নয়। অবশ্য প্রথমেই ইহা সহজ হয় না, যেমন গভীর ধ্যান এবং সমুজ্জ্বল জ্ঞান সহজ হয় না, এমন কি সত্য প্রেম বা ভক্তিও সহজ হয় না, কিন্তু অন্যগুলির ন্যায় এটিকেও আরম্ভ করিতে হইবে যথাযথ ভাব ও অভিনিবেশ লইয়া, তোমার মধ্যে যথাযথ সঙ্কল্প লইয়া—তাহা হইলে আর যাহা কিছু সবই আসিবে।

এই ভাব লইয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা ভক্তি বা ধ্যানেরই মত সমান ফলপ্রসূ। বাসনা, রজোবৃত্তি ও অহং বর্জ্জনের দ্বারা সাধক এমন অচঞ্চলতা ও বিশুদ্ধি লাভ করে যাহার মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি অবতরণ করিতে পারে, আপন ইচ্ছাকে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করিয়া, ভাগবত ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছা নিমজ্জিত করিয়া দিয়া সাধক অহং-এর বিলয় লাভ করে ও বিশ্ব-চেতনায় প্রসারিত হইয়া উঠে, অথবা বিশ্ব-চেতনার ঊর্দ্ধে যাহা রহিয়াছে তাহাতে উন্নীত হয়, প্রকৃতি হইতে পুরুষের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া বহিঃপ্রকৃতির বন্ধনসমূহ হইতে মুক্ত হয়, তাহার আন্তর সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়

এবং বহিঃসত্তাকে যন্ত্রস্বরূপ দেখে। সে অনুভব করে বিশ্বশক্তিই তাহার কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে, আত্মা বা পুরুষ নিরীক্ষণ করিতেছে, সে পুরুষ সাক্ষী কিন্তু মুক্ত, অনুভব করে যে বিশ্বময়ী বা পরাৎপরা জননী অথবা হৃদ্দেশ হইতে যিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন ও কার্য্য করিতেছেন সেই ভাগবতী শক্তি তাহার সকল কর্ম্ম তাহার নিকট হইতে তুলিয়া আপন হাতে লইতেছে ও সম্পন্ন করিয়া দিতেছে। নিজের ইচ্ছা ও কর্ম্ম নিরন্তর ভগবানের নিকট উৎসর্গ করিলে প্রেম ও ভক্তি বর্দ্ধিত হয়, অন্তঃপুরুষ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। ঊর্দ্ধস্থিত শক্তির কাছে উৎসর্গের দ্বারা আমরা এই শক্তিকে ক্রমে ঊর্দ্ধে অনুভব করি, ইহার অবতরণ অনুভব করি এবং ক্রমবর্দ্ধমান চেতনা ও জ্ঞানের দিকে আত্মোন্মীলন অনুভব করি। পরিশেষে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মসিদ্ধি সম্ভব হইয়া উঠে—ইহাকেই আমরা বলি প্রকৃতির রূপান্তর।

অবশ্য এই সকল পরিণতি যে একই সময়ে যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা নহে, সভাব অবস্থা ও বিকাশ অনুসারে তাহারা অল্পাধিক ধীরে অল্পাধিক পূর্ণভাবে আসিয়া দেখা দেয়। ভাগবত সিদ্ধিলাভের কোন সহজ পন্থা নাই।

পূর্ণাঙ্গ অধ্যাত্মজীবনের জন্য গীতোক্ত কর্ম্মযোগ আমি যে ভাবে প্রস্ফুট করিয়াছি তাহা এই। ইহা দার্শনিক গবেষণা ও যুক্তির উপর নয়—পরন্তু অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধ্যান ইহার বহির্ভূত নয় এবং ভক্তিও

নিশ্চয়ই ইহার বহির্ভূত নয়, কেননা, এই কর্ম্মযোগের যে সারতত্ত্ব ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন, ভগবানের নিকট আপন সর্ব্বস্ব সমর্পণ, তাহা মূলতঃ ভক্তিরই ধারা। তবে জীবন হইতে সরিয়া গিয়া কেবল ধ্যানস্থ থাকা অথবা আবেগময় ভক্তির একান্ত আপনার আন্তর স্বপ্নের মধ্যে আবদ্ধ থাকা এই যোগের একমাত্র ধারা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সাধক অনেকক্ষণ ধরিয়া শুদ্ধ ধ্যানে মগ্ন থাকিতে অথবা নিশ্চল আন্তর ভক্তি ও আনন্দে নিমজ্জিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাই পূর্ণযোগের পূর্ণ রূপ নয়।